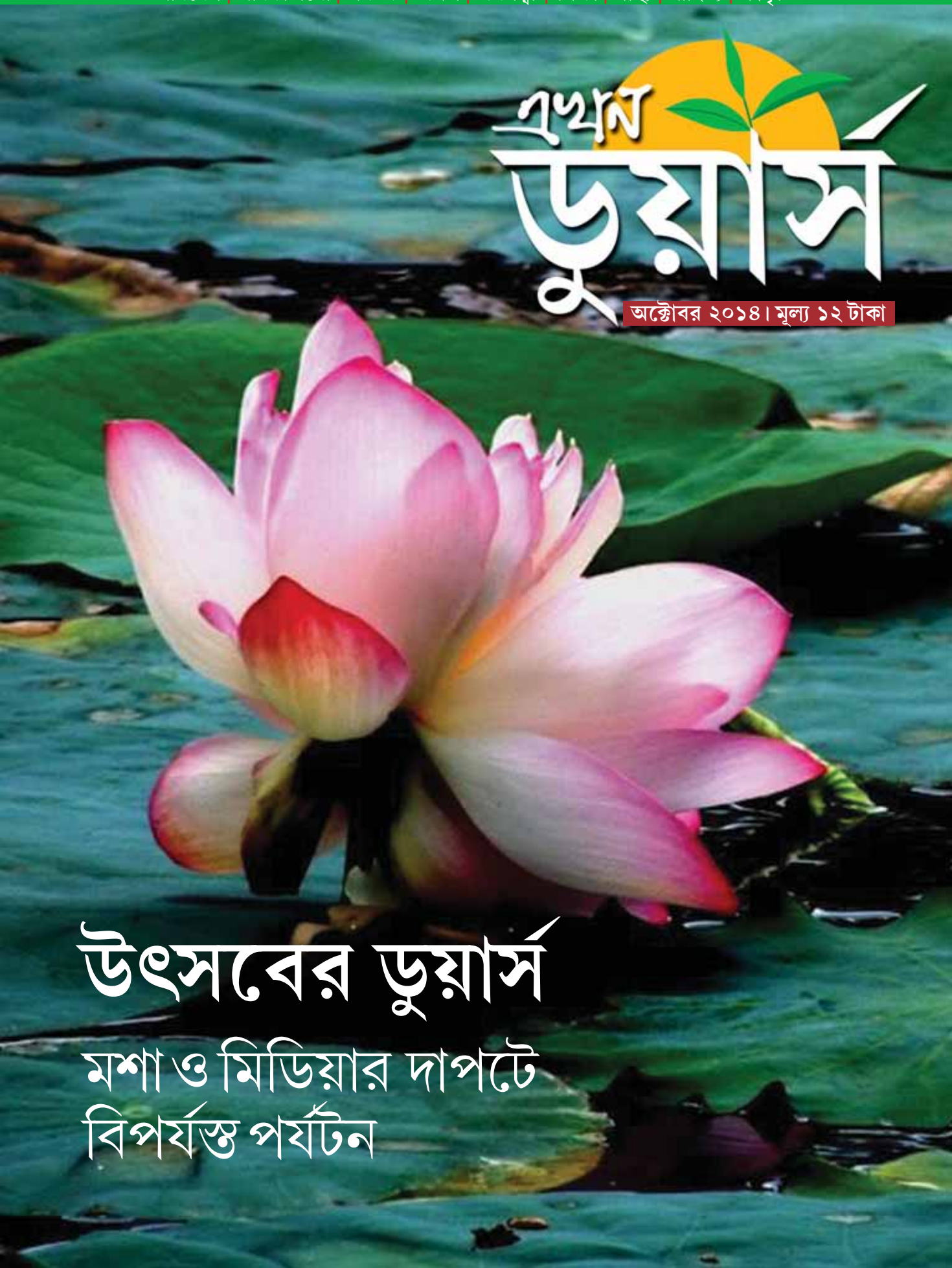

এখন ডুয়ার্স

অক্টোবর ২০১৪। মূল্য ১২ টাকা

উৎসবের ডুয়ার্স

মশা ও মিডিয়ার দাপটে বিপর্যস্ত পর্যটন

এখন ডুয়ার্স

সম্পাদনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
নিখিলেশ রায়চৌধুরী
অমিত কুমার দে

কলকাতা দপ্তর
এই অবকাশে, ১৮/৭ ডোভার লেন,
কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রণ
অ্যালবাট্রস

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

উৎসবে ডুয়ার্সের দশ ৪

মশা ও মিডিয়ার দাপটে
বিপর্যস্ত পর্যটন ১০

বানারহাটের মেলা ১২

চা বাগিচায় দুর্গাপুজো ১৫

জঙ্গলের রূপকথা হলং বনবাংলো ১৮

ডুয়ার্সের দুয়ার ধূপগুড়ি ২৫

ছোটগল্প **অনুক্ত** ২৯

প্রচ্ছদ ছবিটি তুলেছেন সুমন কল্যাণ ভদ্র

ছবি : সুমন কল্যাণ ভদ্র

অনাকাঙ্ক্ষিত

মা সারদা এইচ জি ওয়েলসের টাইম মেশিনের নাগাল পেলে কী কেলোটাই না হত বলুন দেখি! তিরোধানের প্রায় একশ বছর পরে তাঁর নাম নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে যে এমনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তা বোধহয় স্বর্গে বসে স্বয়ং ব্রহ্মাও কল্পনা করেননি। আর একটু হলেই তো দেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে টাটা-বিড়লাদের পরেই স্থান হতে যাচ্ছিল গৌরী সেনের বংশোদ্ভূত (?) অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন এই উদ্যোগপতির। আজ তাঁর করুণ স্খলন দেখলে একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করে, সত্যি বাঙালির দ্বারা আর বাণিজ্য হল না!

টেলিভিশনের পর্দায় ঝকঝকে সেটে চলছে সান্ধ্য বিতর্ক সভা। একে একে লাল-সবুজ-নীল সব গাঢ় রঙের পোশাকে সজ্জিত বক্তারা। তাঁদের কেউ আধচেনা, কেউ খুব চেনা, কেউ বা হাসিহাসি, আবার কারও বা রাগী থমথমে মুখ। কবি বা গায়ক মার্কা এক আঁতেল তরুণ বক্তার এইসব কথা শুনে উদাস হয়ে যান আরেক বক্তা যিনি এককালে পুলিশে ছিলেন, সত্যি চাকরি জীবনে এমন 'সোনালি' দিন দেখতে পাব কখনও ভাবিনি। সারাটা জীবন ঘুষখোর, দুর্নীতিগ্রস্ত ইত্যাদি উপাধি নিয়েই তো চালিয়ে গেলাম। মিনিমাম সম্মানটুকু তো কোনওদিন জোটেনি। আজ তবু খানিক আরাম লাগছে এই ভেবে যে, পুলিশের দিকে আঙুল তোলা এই ক'টা দিন বন্ধ থাকবে। সবাই তো উন্মুখ ধোপদুরস্ত দুষ্কৃতীদের দেখতে।

পরবর্তী বক্তার বিরক্তি যেন ক্রমশ বাড়ছিল, সুযোগ মিলতেই শুরু করলেন— একটি অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ফাজলামি না করে একটা কথা। আমাদের মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোকানি যারা স্বউদ্যোগে জীবন ধারণ করি, যারা চিটফান্ডের দোর্দণ্ডপ্রতাপের দিনে শত প্রলোভনেও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করিনি, তাদের পক্ষ থেকে জানাই, এই বিশাল ঠকবাজি চক্রের একে একে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া দেখে আমরা কিন্তু অবাক হয়নি। কারণ আমরা দেখেছি বাড়িভাড়া দোকানভাড়া ছোট ছোট মফস্সল এলাকায় কী রকম অস্বাভাবিক জায়গায় পৌঁছেছিল। ডাবল মাইনে অফার করেও কাজের ছেলেমেয়ে পাওয়া যেত না। চাষের জমির দাম এমন হয়েছিল যে চাষি নিজেই অবাক, এ কোন্ রূপকথার দিন এল গো! শিক্ষিত-অশিক্ষিত-বন্ধু-আত্মীয় বা বাড়ির কাজের মাসি কাউকেই বুঝিয়ে ফেরাতে পারিনি, সেদিন সবার লোভ-আকাঙ্ক্ষা বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে আকাশ ছুঁয়েছিল।

সঞ্চালকের সম্মতিক্রমে এবার দর্শকাসন থেকে উঠে দাঁড়াল এক তরুণ। কিন্তু মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে এত দিনেও কেউ প্রশ্ন তুলছেন না কেন? যারা সমাজের 'ওয়াচডগ' তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করে গেল একের পর এক ভুঁইফোড় কোম্পানির বাড়বাড়ন্ত! এদের কার্যকলাপ নিয়ে সরব হওয়া তো দূরের কথা, এদের দেওয়া বিজ্ঞাপনের টাকায় পুষ্ট হয়েছে কমবেশি প্রায় সবাই। এদের স্পনসরশিপ নিয়ে নামজাদা চ্যানেলের জনপ্রিয় শো চলেছে দিনের পর দিন। ক'জন সেই বিজ্ঞাপনের প্রলোভন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পেরেছেন, অনুসন্ধান সব কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল সে সময়?

আজ কোনও চ্যানেল বা খবরের কাগজ কি স্বেচ্ছায় ঘোষণা করার সাহস দেখাবে যে, গত কয়েক বছরে চিটফান্ডের কত কোটি টাকার বিজ্ঞাপন তাদের ঘরে এসেছিল? সেইসব টাকা কি সাধারণ মানুষের কষ্টের জমানো অর্থ নয়? মিডিয়া বলে কি তাদের অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে দেখা হবে না? নাকি গোয়েন্দা তদন্তে মিডিয়ার সাত খুন মাফ?

বিতর্কসভা অবশ্য এর পর বেশিক্ষণ চলেনি। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে বক্তারা সবাই একমত হয়েছিলেন, এতকিছু সত্ত্বেও আমাদের 'সদা সজাগ' মিডিয়ার দুর্দান্ত আপসহীন ভূমিকায় আমরা জানি এইসব কেলেঙ্কারির রহস্য শীগগিরই মানুষের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে, ধরা পড়বে অপরাধীরা। এরপর পরিচিত ঝংকারে শুরু হয়ে গিয়েছিল সান্ধ্য হেডলাইন।

সেই দামী বিতর্কসভা থেকে বহুদূরে দোমহনি কিংবা ফালাকাটা বা বারবিশার গঞ্জ এলাকার কোনও জীর্ণ চা-দোকানের ভাঙা বেঞ্চে ঘোলা চোখে বসে থাকে গুটিকয়েক বুড়োটে মানুষ। আরও একটা পুজো এসে গেল, এবারও পরিবারের বাচ্চাগুলোর নতুন জামা-প্যান্ট হল না। জমিজমা যেটুকু ছিল সব বেচে খেয়ে শেষ। সি বি আই হলে আশা আছে বলে যেসব মুরুব্বি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তারাও এখন বেপাত্তা। কলকাতা শহর যে বড্ড দূরে আর পুরোপুরি অচেনা। তবু যারা কলকাতার কাছাকাছি থাকে তারা তো গিয়ে দরবার করতে পারে, কিন্তু এতদূরে থেকে তো সে সাহসও হয় না। এক মায়াবী রাক্ষসের ছলনায় যাবতীয় ধন খুইয়ে নিঃস্ব মানুষগুলি রোজ এই রকম চুপচাপ বসে থাকে। আর তাদের পাশে হেলায় পড়ে থাকে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাওয়া সেদিনের খবরের কাগজ। সময় যে এখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

উৎসবে ডুয়ার্সের দশ

মালবাজার অবধি মিটার ট্যাক্সিতে !

এবার থেকে ডুয়ার্স বেড়াতে গেলে বাগডোগরা বা এনজেপি কিংবা শিলিগুড়ি থেকে মিটার ট্যাক্সিতে পৌঁছে যেতে পারবেন মালবাজার অবধি। মানে অনেকটাই খরচ কম। শিলিগুড়িতে মিটার ট্যাক্সি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ মিলবে ঠিকই, কিন্তু এতদিনের বেসরকারি ভাড়ার গাড়ির কাছ থেকে বাধা বা হুমকির আশঙ্কা প্রথমদিকে থেকেই যাচ্ছে। এতদিনকার জমি তারা চট করে ছেড়ে দেবে না বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল সবাই। বিশেষ করে উৎসবের মরশুম মানেই পর্যটকদের পকেট থেকে বেশি খসানোর সুযোগ। সেই সুযোগ কি তারা এবার এত সহজে ছেড়ে দেবে? মনে তো হয় না।

তবে দার্জিলিং পাহাড় কিংবা সিকিম যেতে হলে আর ওই ট্যাক্সির সুবিধা পাবেন না পর্যটকরা। সেক্ষেত্রে গন্তব্যে পৌঁছতে তাঁদের বেসরকারি গাড়িই নিতে হবে। নিউ জলপাইগুড়ি বা বাগডোগরা হয়ে যাঁরা উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই ভ্রমণসূচিতে পাহাড় ও সিকিম থাকে। কিন্তু পরিবহণ দপ্তরের বিধিতে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের এলাকাতেই পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মিটার ট্যাক্সিকে। ফলে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে জলপাইগুড়ির মালবাজার পর্যন্ত যাত্রীরা মিটার ট্যাক্সি নিতে পারলেও দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটকের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ পাবেন না। ফলে, আসন্ন পুজোর সময় মিটার ট্যাক্সি পাওয়া গেলেও পাহাড়ে যেতে ইচ্ছুক পর্যটকদের বেসরকারি গাড়িচালকদের হাতে হেনস্তা হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করলেও পরিকল্পনাটি পুরো সফল হওয়া নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সমস্যাটি অস্বীকার করছে না পরিবহণ কর্তৃপক্ষ।

তবে নিউ জলপাইগুড়ি ও বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি অনেক কম ভাড়ায় মিটার ট্যাক্সিতে যাতায়াতের সুবিধা মিলবে। পরিবহণ দপ্তর যে ভাড়ার হার ঘোষণা করেছে, তাতে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যে কেউ ওই ট্যাক্সিতে মাত্র ৭৫ টাকায় শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারবেন। বাগডোগরা থেকে ওই ভাড়ার পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬০ টাকা। এসি ট্যাক্সি নিলে অবশ্য ভাড়া বেশি হবে।

বাজারে মিলবে ডুয়ার্সের মধু

এবার পুজোর মরশুমের মধ্যেই বন দফতরের উদ্যোগে বাজারে আসতে চলছে ‘মধু’। উত্তরবঙ্গের মধুচাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের পর বোতলজাত করে ‘মধু’ নামে সুদৃশ্য লেবেলিং করার পর বিক্রি হবে। এতদিন সরকারি উদ্যোগে কেবলমাত্র বন উন্নয়নের নিগমের তৈরি সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকার মধু উত্তরবঙ্গে বিক্রি হত। কলকাতা থেকে এনে তা বিভিন্ন এলাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করা হত। এ বারই প্রথম উত্তরবঙ্গের মধুচাষিদের আর্থ-সামজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় মধুর বাণিজ্যকরণ শুরু করতে চলেছে বন দফতর।

এনটিএফপি ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএফও জানান, আমরা সুন্দরবনের মধু এনে যা বিক্রি করি, তার থেকে প্রচুর বেশি চাহিদা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধুর এমনভাবে বাণিজ্যকরণ আগে হয়নি। তিনি জানান, মধু বোতলজাত করার জন্য সরকারি ড্রাগ লাইসেন্স দরকার হয়। দুই সপ্তাহ আগে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার বিষয়ক দফতর থেকে সেই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

বন দফতর সূত্রের খবর, সুন্দরবন এলাকায় জঙ্গলের বন্য মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়া করা হয় কলকাতার বন উন্নয়ন নিগমের কারখানায়। উত্তরবঙ্গে প্রতি বছর খুব কম করে ১০ টন বিক্রি হয়। ৫০০ গ্রাম এবং ১ কেজির বোতলে ওই মধু ২৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এটা মাথায় রেখেই গত তিন-চার মাস আগে কাজ শুরু করে এনটিএফপি ডিভিশন। সমীক্ষায় দেখা যায়, কার্শিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকা ছাড়াও ডুয়ার্সের বক্সাদুয়ার, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, বান্দাপানি, শালকুমার, খুট্টিমারি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মধুর চাষ হয়।

দফতরের উদ্যোগেই অনেক জায়গায় মৌমাছি পালনের জন্য ‘অ্যাপিয়ারি বক্স’ দেওয়া হয়। ডুয়ার্সের অনেক জায়গাতেই দেখা যায়, হাতির উপদ্রব কমাতে মৌমাছি চাষ হচ্ছে। সরষে, লিচু, কমলালেবু, শাল, জারুল, দণ্ডকলসের বাগান যে সমস্ত এলাকায় রয়েছে, সেখানেই ভালো মধু চাষ হচ্ছে। তিন কিলোমিটার অবধি উড়ে উড়ে মৌমাছিরা

মধু সংগ্রহ করে। সেই হিসাবেই বক্স বসিয়ে তাতে রানি মৌমাছি ঢোকানো হয়। বর্ষার পর থেকে মধুর চাক তৈরি হয়ে যায়। পরে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের যাহায্যে মৌচাক না ভেঙে মধু সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ফের একই চাকে মধু হয়।

কিন্তু মৌচাক থেকে উৎপন্ন মধু ডুয়ার্সে সেভাবে বাজারজাত হয় না। অনেকেই ফড়েদের মাধ্যমে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের মত বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন। স্থানীয়ভাবে গ্রামেগঞ্জেও তা বিক্রি হয়। কিছুদিন ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন রিসর্টে পর্যটকদের জন্য এবং বিউটি ক্লিনিকগুলিতে স্থানীয় মধু সরবরাহ হচ্ছে। কিন্তু সবই বিক্ষিপ্তভাবে হওয়ায় চাষিরা উপকৃত হয় না।

আপাতত আগামী শীতের মরশুমের কথা মাথা রেখে প্রথম দফায় ২ টন মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে, পরে এনটিএফপি ডিভিশনের বাগডোগরা লাগোয়া কারখানায় তার প্রক্রিয়াকরণ হবে। বিভিন্ন বস্তি থেকে সংগ্রহ করা মধু ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে 'আলট্রা-ভায়োলেট রে'র মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করার পর বোতলজাত করা হবে। ডিএফও জানান, চাষিদের থেকে ১৫০-২০০ টাকা কেজি দরে প্রতি কেজি কিনে তা প্রক্রিয়ার পর ২৫০ টাকার কাছাকাছি দরে বাজারে বিক্রি করা হবে। চাষিদের উৎসাহ বাড়াতে লাভের একটি অংশ তাদেরও দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

চা পর্যটনের অভিনব উদ্যোগ

হোক না ছোট্ট উদ্যোগ, কিন্তু অভিনবত্বে এক নম্বর। তথাকথিত 'হেরিটেজ' গ্ল্যামার নেই, বাংলো নেই, চাকর-খানসামা নেই, সরকারি নীতির কড়া ফাঁস নেই, ওয়েবসাইট নেই। তবু বলা যায়, চা-পর্যটন।

শারদোৎসবে ভোজন রসিকবাঙালির রসনা তৃপ্তি দিয়েই চা পর্যটনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে গৌরীহাট বাগান সংলগ্ন এলাকায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় ৬ বছর থেকে নিজের ছোট্ট এক টুকরো চা-বাগান ঘিরে যে পর্যটনের জাল বুনেছেন শহরের এক তরুণ, পুজোয় তাই 'গ্রিন ভিউ ফেস্টিভ্যাল' নামে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবারের পুজোয়। জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগঠনের কর্তারা ইতোমধ্যেই ওই চা-বাগান এলাকা ঘুরে দেখেছেন। জেলার আরও কয়েকটি ছোট বাগানে এ ধরনের পর্যটনের পরিকল্পনা নেওয়া যায় কি না সে চিন্তাভাবনাও করছেন। তাঁদের মতে, জেলায় প্রায় ২০ হাজার ছোট চা-বাগান আছে। তার কয়েকটিকে ঘিরে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠতেই পারে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে ১৮ একরের বাগানটির তিন দিকে তিরতির করে বাইছে করলা নদী। তার মাঝে দ্বীপের মতো জেগে ওঠা নলখাগড়ার জঙ্গল আর মাঝেমধ্যে গামার, শিরিষ, নিমের মতো গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট বাহারি কটেজ। একসঙ্গে ৭০ জন বসে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন অনায়াসে। রয়েছে কনফারেন্স রুম, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান। চড়ুইভাতির পৃথক আয়োজন রয়েছে।

আরও ব্যাপার হল এখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ। উৎসবের উদ্যোক্তা তথা বাগান মালিক শোভন সরকার জানান, ২০০৮ সালে নলখাগড়ার জঙ্গল সরিয়ে বাগান তৈরির পর থেকে নিজের মতো করে 'টি টুরিজমের' প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তিনি। প্রথমে তেমন সাড়া মেলেনি। হতাশ হতে হলেও হাল ছাড়েননি শোভন। অবশেষে ফল মিলেছে।

তিন-চার বছর ধরে প্রতিদিন বিকেলে গড়ে ৫০ জন শহর থেকে বেড়াতে যান। উৎসবের দিনে ভিড় আরও বাড়ে। গত পুজোয় প্রতিদিন গড়ে হাজারেরও বেশি লোক এসেছেন বলেও জানা গিয়েছে। এ বার অবশ্য পর্যটক টানতে বাগান আরও সুন্দরভাবে ঢেলে সাজার কাজ চলছে। চা-বাগানের সবুজের মাঝে তৈরি হচ্ছে পর্যটন পরিকাঠামোর কাজ। তবে পর্যটকদের খাবারের মান নিয়ে কোনও রকম খুঁত রাখতে রাজি নন উদ্যোগীরা। খাবারের গুণগত মান আরও কতটা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন নামী রেস্তোরাঁর সঙ্গে আলোচনাও চলছে বলে জানান শোভনবাবু। সঙ্গে আদিবাসী নাচের আয়োজন করা যায় কি না সে চেষ্টাও চলছে।

পুজোয় নয়া পর্যটন কেন্দ্র

পুজোতে পর্যটকদের নতুন গন্তব্যের হদিশ দিতে উদ্যোগী হয়েছে মালবাজার মহকুমা প্রশাসন। গরুমারা লাগোয়া লাটাগুড়ি, মূর্তি, ধূপঝোড়া বা সামসিং— সর্বত্রই পর্যটকদের কেন্দ্র তৈরি করেছে মালবাজারের মহকুমা প্রশাসন। এ ছাড়াও যারা ডুয়ার্সের পথে ঘুরতে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে বিশ্রামাগার।

মালবাজার শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে পশ্চিম ডামডিম এলাকার চেল নদীর ধারে চা-বাগান লাগোয়া এলাকায় ১৯ বিঘা এলাকায় তৈরি হয়েছে পর্যটন আবাস। চেল নদীর ওপারে কাঠামবাড়ি আর তারঘেরার জঙ্গল। ভুট্টাবাড়ির জঙ্গল থেকে হাতির পাল প্রায় রাতেই পশ্চিম ডামডিম থেকে চেল নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। হাতিদের এই যাতায়াত দেখাই এই পর্যটন কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ। ছয়টি কটেজ রয়েছে এই কেন্দ্রে। রিসর্টে তদারকি, রান্না সব কিছুর দায়িত্বে থাকছেন ডামডিম, বেতগুড়ি, কুমলাই চা-বাগানের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

বুকিং করতে হলে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট কিংবা মালবাজার মহকুমা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে যাঁরা শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি বা বাইকে চেপে ডুয়ার্সে আসেন তাঁদের সাময়িক বিশ্রামের প্রয়োজনে কথা চিন্তা করে মালবাজার এবং চালসার মাঝখানে মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি মোড়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই পর্যটন বিশ্রামাগার তৈরির কাজও শেষ। এই কেন্দ্রে পর্যটকরা স্নান করে নিতে পারবেন, সঙ্গে চা-জলখাবারের ব্যবস্থাও থাকছে। বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসেও খাওয়া যেতে পারে। প্রায় দুই বিঘারও বেশি জায়গায় এখানে তৈরি হয়েছে উদ্যান-কৃত্রিম জলাশয়। মেটেলি ব্লকে মেটেলিবাজার লাগোয়া রাষ্ট্রভাষা স্কুলে কাছে একটি পর্যটক বিশ্রামাগার তৈরির কাজ চলছে। চালসা লাগোয়া জঙ্গল এলাকাতে ৮ বিঘারও বেশি জায়গা নিয়ে মেটেলি ব্লক প্রশাসন কটেজ আকারে রিসর্ট তৈরির কাজ শুরু করেছে বলে জানানো হয়েছে। তবে সেটি অবশ্য এবারে পুজোতে শেষ হচ্ছে না।

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুরে খরচ কমাচ্ছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম

পুজোয় পর্যটক টানতে ভ্রমণ প্যাকেজের খরচ আগের থেকে অন্তত ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কমিয়ে দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। পুজো এবং শীতের সময়ে কোচবিহার থেকে ৭টি রুটে প্যাকেজ টুরের ব্যবস্থা করেছে নিগম। কোচবিহার থেকে জলদাপাড়া জঙ্গল সাফারিসহ ঝালং-বিন্দু প্যাকেজে খাওয়া ও যাতায়াত নিয়ে খরচে মাথাপিছু ১২৫০ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। আগের মরশুমে একদিনের ওই প্যাকেজের খরচ ছিল মাথাপিছু ১৬০০ টাকা। একইভাবে কোচবিহার থেকে ভুটানের ফুন্টশোলিং গুম্ফা হয়ে চিলাপাতা জঙ্গল সাফারির প্যাকেজের পর্যটকদের মাথাপিছু খরচ ধার্য করা হয়েছে ১১০০ টাকা। আগের মরশুমে খরচ ছিল মাথাপিছু ১৩০০ টাকা।

নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জানান, ভ্রমণ প্যাকেজে ফের জোর দেওয়া হয়েছে। পর্যটক টানতেই এবার খরচ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাভ কম রেখে ভ্রমণ প্যাকেজের প্রচার বাড়ানোও অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, খরচ কমাতে গিয়ে লোকসানের মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবে না তো এই প্যাকেজ? নিগমের কর্তারা যদিও তা মানতে চাননি। নিগমের পর্যটন শাখা 'সবুজের পথে হাতছানি'র সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা জানান, প্যাকেজ ট্যুরের জন্য নির্দিষ্ট বাসে সাধারণত গড়ে ২৮টি আসন রাখা হয়। আগের মরশুমগুলিতে ন্যূনতম ১২ জন পর্যটক হলেই বাস ছেড়ে দিত। মাথাপিছু গড় খরচ বেশি হত। এবার প্রতিক্ষেত্রেই ন্যূনতম ১৮টি আসন 'বুকিংয়ের' লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ৬ জন বাড়তি পর্যটক হওয়ায় মাথাপিছু খরচ কমবে।

এ বার আরও পাঁচটি রুটে বেড়ানোর সুযোগ থাকছে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য। ভুটানের থিম্পু-পারো যাওয়ার সুযোগও রয়েছে। এছাড়াও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য প্রকৃতিপাঠের বিশেষ বন্দোবস্তও করছেন নিগম কর্তৃপক্ষ।

পুজোয় পর্যটকদের জন্য বাস

পুজোয় পর্যটকদের গন্তব্যে পৌঁছাতে ২৮টি বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের নানা রুটে বাসগুলি চলবে। সংস্থার চেয়ারম্যান গৌতম দেব সাম্প্রতিক বোর্ড মিটিংয়ের পর জানান, পুজোর আগে ২৬টি বাস নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি ভলভো বাস দূরপাল্লা রুটে চলবে। সেইসঙ্গে কোচবিহারে একটি দোতলা বাস চালানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

বক্সার জঙ্গলে জিপসি সাফারি

চার বছর পরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকায় পর্যটকদের কার সাফারির অনুমতি দিতে চলেছে বন দফতর। সম্প্রতি রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে গাইডদের সঙ্গে বৈঠক করেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ক্ষেত্র অধিকর্তা ও আধিকারিকরা। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ম মেনে জিপসি গাড়িতে চেপে পর্যটকরা জঙ্গলে ঘুরতে পারছেন বলে দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। কোর এলাকার ভুটানঘাট, জয়ন্তীর ২৬ মাইল সহ অন্যান্য এলাকায় পর্যটকদের সাফারির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্তারা জঙ্গলের কোর এলাকা জয়ন্তীর ২৬ মাইল এবং ভুটানঘাটে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ করে দেন। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপ-ক্ষেত্র অধিকর্তা বলেন, 'জিপসি গাড়িতে বাণিজ্যিক নম্বর থাকলেই ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি মিলছে। বন্ধ থাকা এলাকাগুলি পর্যটকদের জন্য নিয়ম মেনে খোলা হয়েছে।'

জয়ন্তী টুরিস্ট গাইড ইউনিয়নের সম্পাদক শেখর ভট্টাচার্য বলেন, 'তাসিগাঁ পুখরি, জয়ন্তী ২৬ মাইল, ভুটানঘাট, চুনিয়া ভুটানবস্তি, রাজাভাতখাওয়া, ২৮ মাইল ও ২৫ মাইলে কার সাফারির অনুমতি মিলবে।' ইস্টার্ন ডুয়ার্স রিসর্ট ও ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রামকুমার লামা বলেন, 'বক্সায় ঘুরতে এসে পর্যটকরা এতদিন নিরাশ হতেন। বন দফতর ফের ওই অনুমতি দেওয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশা করছি।'

ভুটানে ঢোকার পারমিট দ্রুত পেতে পর্যটকদের জন্য ব্যবস্থা

উত্তরবঙ্গ হয়ে যাঁরা সড়কপথে ভুটান বেড়াতে যান তাঁদের অনেককেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কলকাতার ট্রেন নিউ জলপাইগুড়িতে ঢোকার পর সেখান থেকে সড়কপথে জয়গাঁ পৌঁছতে অনেক সময়ই বিকেল হয়ে যায়। বিমানে বাগডোগরা পৌঁছেও একই সমস্যা। আর লেট থাকলে তো কথাই নেই। ট্রাভেল এজেন্টরাও তাই পরামর্শ দেন প্রথম রাতটা ফুন্টশোলিং বা জয়গাঁর হোটেলে কাটাতে। তার প্রথম কারণ পাহাড়ে দিনের আলোয় গন্তব্যে পৌঁছানো অধিক কাম্য। আর দ্বিতীয় কারণ বিকেল পাঁচটায় অভিবাসন দফতর বন্ধ হয়ে যায়। আর এত দিন বেড়াতে যান কিংবা ব্যবসা বা অন্য কাজে, কাউন্টার ছিল একটাই।

'এন্ট্রি পারমিট' নিয়ে ভারতীয় পর্যটকদের এইসব সমস্যা মেটাতেই উদ্যোগী হয়েছে ইন্দো-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএফএ)। ভুটানের তরফে তাঁদের জানানো হয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় কয়েকদিন ধরে কেবলমাত্র পর্যটকদের জন্য আলাদা তিনটি কাউন্টার চালু হয়েছে। এতে লাইনে দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে পারমিট সংগ্রহের ঝামেলা থাকছে না। ভি আই পি থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাগডোগরা বা এন জে পি থেকে দেরিতে আসা পর্যটকদের জন্য ফুন্টশোলিং-এর ভুটান গেটের অফিস থেকে বিশেষ পারমিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিবাসন দফতরে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি পারমিট দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে দ্রুত ভুটান গেটের লাগোয়া এলাকায় নতুন ভবনের কাজ শেষ হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে, তাতে পর্যটকদের জন্যই আলাদা আটটি কাউন্টার করা হচ্ছে।

সড়কপথে ভুটানে যেতে ফুন্টশেলিং থেকে ভারতীয় পর্যটকদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে থিম্পু ও পারোর জন্য পারমিট নিতে হয়। সচিত্র পরিচয়পত্র না থাকলে ভারতীয় দূতাবাস থেকে বিশেষ আইডেনটিফিকেশন স্লিপ নিয়ে পারমিট করতে হয়। থিম্পু বা পারো ছাড়াও পুনাখা, ওয়াংদি, বুমথাং, মঙ্গার, হা ভ্যালি ঘোরার জন্য থিম্পু অভিবাসন দফতর থেকে স্পেশাল এরিয়া পারমিট নিতে হয়। এতদিন পারমিট পেতে পর্যটকদের জন্য আলাদা কাউন্টার না থাকায় সমস্যা লেগেই থাকত। দল বেঁধে ভুটানে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক-কর্মীদের লাইন থাকলে পারমিট পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যেত পর্যটকদের।

গত জুন মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভুটান সফরে গিয়েছিলেন। দুই দেশের সম্পর্ক বরাবরের মত মজবুত রাখার উপর প্রধানমন্ত্রী জোর দেন। তার পরেই ভুটানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই পদক্ষেপে খুশি এদেশের পর্যটনের সঙ্গে জড়িত সংগঠনগুলি। সবার মতে, পর্যটক হয়রানি কমা মানেই উন্নত পরিষেবা।

আবার রঙিন আলোয় সাজছে কোচবিহারের রাজবাড়ি

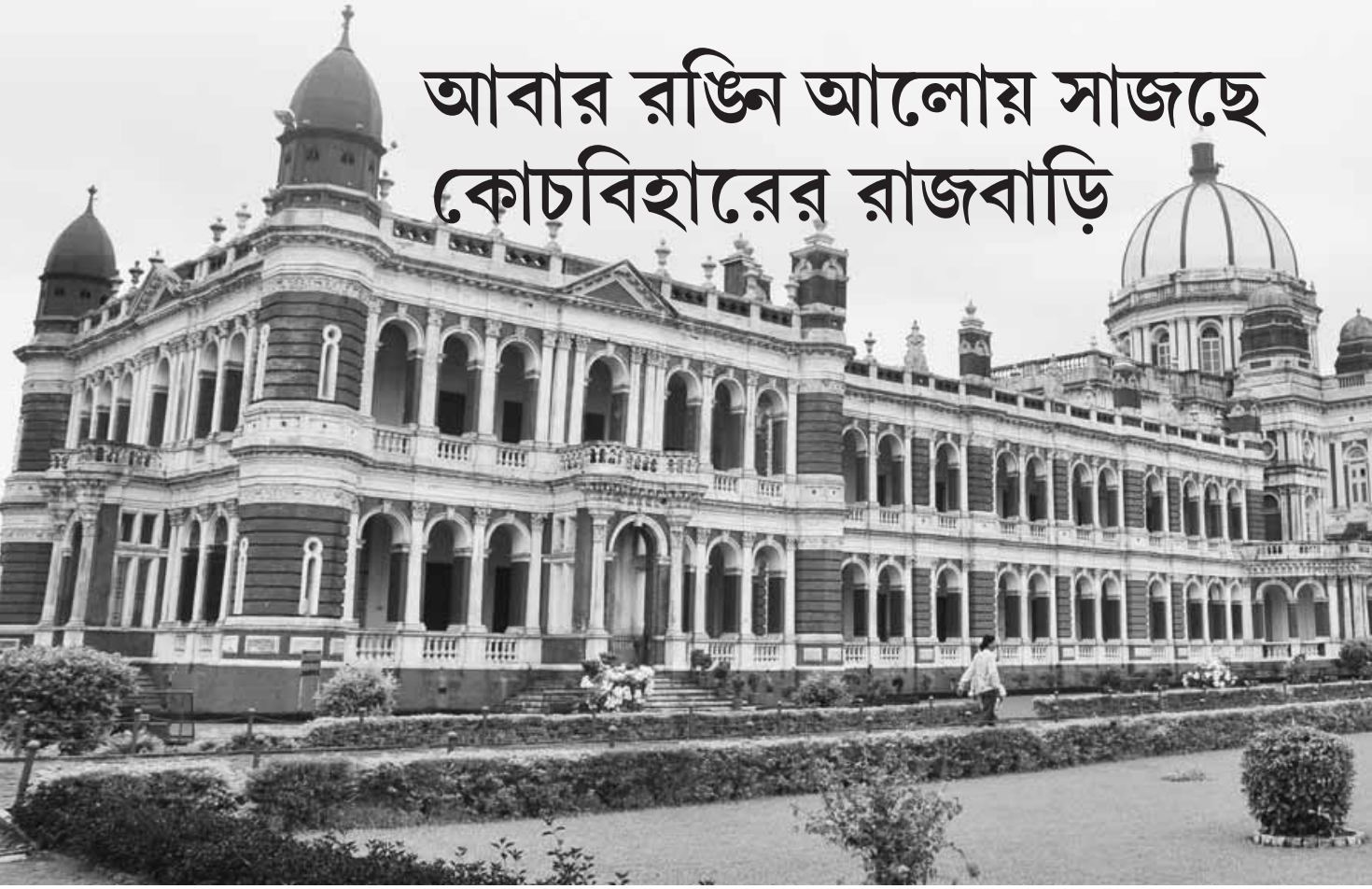

পর্যটকদের টানতে এ বার পুজোর আগে কোচবিহার রাজবাড়ি 'এল ই ডি' আলোয় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ইতোমধ্যেই একাধিক সংস্থার সঙ্গে প্রশাসনের কর্তাদের প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আলোকসজ্জিত নয়া চেহারায় সেজে ওঠা রাজবাড়ির মডেল তৈরি করে দেখানো কথা বলেছেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে একইসঙ্গে পুজোর আগে মদনমোহন মন্দিরে মূল প্রবেশপথ লাগোয়া রাস্তাজুড়ে 'এল ই ডি' আলোকতোরণ বসানো হবে। রাজবাড়ির গম্বুজ খিলান থেকে শুরু করে সামনের আঙিনা সবটাই বাহারি রঙিন আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৮৭ সালে বিশালাকার এই রাজবাড়ি তৈরি হয়। ১৯৮২ সালে প্রাসাদটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ দফতর অধিগ্রহণ করে। প্রতি বছর এই প্রাসাদ দেখার টানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তো বটেই, বিদেশের পর্যটকেরাও কোচবিহারে আসেন। গত তিন মাস ধরে গোটা প্রাসাদ চত্বর সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে। প্রাসাদের আলোকসজ্জায় দুই দফায় মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়েছিল। ১৯৯৮-এ কলকাতার একটি সংস্থার মাধ্যমে রাজপ্রাসাদ সাদা আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বছর পাঁচেকের মধ্যে তা বিকল হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে রাজ্য পর্যটন দফতর প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে নানা রঙের আলোয় রাজবাড়ি সাজিয়ে তোলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি, সবুজ— বাহারি নানা আলো ঠিকরে পড়ত প্রাসাদের গম্বুজ থেকে আঙিনা সর্বত্র। ২০১২ সাল থেকে যন্ত্রাংশে জল ঢুকে সেসবও বিকল হয়ে পড়ে। পুরনো সাদা আলো মেরামতি করে জ্বালানো হলেও তিন মাস ধরে তাও বিকল রয়েছে।

প্রতিবার বিপুল টাকা খরচ করে আলোকসজ্জার পর রক্ষণেবেক্ষণ ঠিক মতো হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বার বরাত পাওয়া সংস্থাকে ৫ বছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মদনমোহন মন্দির চত্বর ঢেলে সাজতে উদ্যোগ

রাসমেলার আগে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির ও সংলগ্ন এলাকাকে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এর জন্য এক কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন শহরের সাগরদিঘি লাগোয়া এলাকা থেকে জেল মোড় পর্যন্ত প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তায় আলোকসজ্জার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আনন্দময়ী ধর্মশালার পরিকাঠামো উন্নয়ন করে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর চালু, বৈরাগি দিঘির পাড় বাঁধানো এবং

মন্দির চত্বর সাজানোর মতো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটও চালু করা হচ্ছে। জেলাশাসক জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দ ৭৪ লক্ষ টাকা খরচ করে আলোকসজ্জার জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। খুব দ্রুত কাজের বরাত দেওয়া হবে। রাসমেলার আগে ওই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিই আলো রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বিল মেটাবে বোর্ড।

সাগরদিঘি প্রান্ত থেকে জেল গেট অবধি ওই রাস্তার পাশে কোচবিহারের অন্যতম আকর্ষণ মদনমোহন মন্দির। ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে পামতলা মোড় থেকে আনন্দময়ী ধর্মশালার সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় আলোকসজ্জা করার কথা ভাবা হয়। পরে এলাকা আরও বাড়ানো হয়। আনন্দময়ী ধর্মশালার পরিকাঠামো উন্নয়নে পর্যটন দফতর ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ওই টাকায় ধর্মশালার ছটি নতুন ঘর তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে দুটি ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। মদনমোহন মন্দির চত্বরে যাতায়াতের রাস্তা নতুন করে তৈরি এবং সাজানোর কিছু কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। মন্দির বৈরাগি দিঘির পাড় পাকা করতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। দিঘির জল কমলে ওই কাজ শুরু করা হবে। ওয়েবসাইটের জন্য খরচ হবে এক লক্ষ টাকা।

দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভক্তরা এবার ঘরে বসেই কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের 'লাইভ পুজো' দেখার সুযোগ পাবেন। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিষদীয় সচিব। ওই অনুষ্ঠানেই দেবোত্তর কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওই 'লাইভ পুজো' দেখানোর কথা ঘোষণা করেন তিনি। জেলাশাসক তথা বোর্ডের সভাপতি বলেন, পর্যটকদের কাছে মদনমোহন মন্দির-সহ অন্য মন্দিরগুলিকে তুলে ধরতেই এই ওয়েবসাইট চালু করা হল। খুব শীঘ্রই লাইভ পুজো দেখার ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যের পরিষদীয় সচিব বলেন, "কর্মসূত্রে কোচবিহারের বহু বাসিন্দা দেশে-বিদেশে থাকেন। সরাসরি পুজো দেখার সুযোগ তাঁদের কাছে বাড়তি পাওনা। পর্যটকদের জেলায় আসার প্রবণতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও ওয়েবসাইটটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।"

বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, এর কয়েক মাস আগে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে মদনমোহন মন্দিরের পুজো দেওয়ার বন্দোবস্ত চালু করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট খুলে ওই পুজোর খরচ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে অন্য বেশ কিছু মন্দিরের সম্পর্কেও তথ্য রয়েছে। শুধুমাত্র দেবোত্তরের আওতাধীন মন্দিরগুলিকে প্রচারে আনতে ওয়েবসাইটের কাজ শুরু হয়।

প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি এই ওয়েবসাইটে মদনমোহন মন্দিরের ছবি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লাগোয়া অন্যান্য মন্দিরের সম্পর্কে তথ্য, যাতায়াতের রুট, থাকার বন্দোবস্ত থেকে পুজোর নিয়মাবলি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য রয়েছে। কোনও বিশেষ তিথিতে বা বিশেষ কারণে কেউ পুজো দিতে চাইলেও ওয়েবসাইট খুলে তা বাছাই করে নির্দিষ্ট খরচ বোর্ডের অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। তার ভিত্তিতে আগ্রহী আবেদনকারীকে কবে তাঁর নাম-গোত্র উল্লেখ করে পুজো দেওয়া হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ওই সময় ওয়েবক্যামেরার মাধ্যমে সাইটটি খুলে তিনি সরাসরি পুজো দেখতে পারবেন। বোর্ডের সদস্য তথা কোচবিহারের সদর মহকুমা শাসক বলেন, 'পুজোর আগেই লাইভ পুজো দেখার ওই ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। এর জন্য মদনমোহন মন্দির চত্বরে ক্যামেরা বসানো হয়েছে।'

dtbcoochbehar.com/dtb/home.php

মশা ও মিডিয়ার দাপটে বিপর্যস্ত পর্যটন

মশাবাহিত অচেনা রোগের মারণযজ্ঞ ডুয়ার্সে এবার বাড়াবাড়ি রকমেরই হয়েছিল তা ঠিক কথা এবং এও ঠিক যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে রীতিমত তটস্থ করে রেখেছিল সংবাদমাধ্যমগুলির লাগাতার আক্রমণ। কিন্তু এই প্রশংসনীয় ভূমিকার আতিশয্যে আরেকটি দিক যে ক্ষতিগ্রস্থ হযে গেল সেদিকে খেয়াল নেই তাদের। এ অভিযোগ ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সবারই।

ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার এনেছিল পর্যটন। বিগত পনেরো বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই শিল্প। প্রধানত গরুমারাকে কেন্দ্র করে লাটাগুড়ি এবং মূর্তি হয়ে ওঠে পর্যটকদের উল্লেখযোগ্য গন্তব্য। মাদারিহাট এবং বক্সা-জয়ন্তীও ক্রমশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল। কিন্তু বিগত বছর দুয়েক গোটা ডুয়ার্সের পর্যটনই জোর ধাক্কা খেয়েছে। এবার পুজোর ছুটিতে ডুয়ার্সের অধিকাংশ রিসর্টই খালি। একদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্র বিবরণ দিয়ে চলেছে যে, এবার ডুয়ার্সের বিভিন্ন সরকারি বাংলোগুলি পর্যটকের ভিড়ে উপচে পড়বে। সরকারি বাংলোতে অগ্রিম বুকিং-এর দীর্ঘ তালিকা। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাহাকার। সরকারি বাংলোগুলোর অগ্রিম বুকিং কোনও ভাবেই এই অঞ্চলের পর্যটনের সূচক হতে পারে না। গরুমারা-মূর্তি অঞ্চলের গোটা চারেক আর মাদারিহাটের একটি সরকারি বাংলো যদি সম্বৎসর পর্যটকে ঠাসাও থাকে, তবু ডুয়ার্সে পর্যটকের 'ঢল', একথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। গোটা ডুয়ার্সের পর্যটন দাঁড়িয়ে আছে বেসরকারি পরিকাঠামোর ওপর।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানাচ্ছিলেন যে, পুজোয় অন্যান্যবার ২০-২৫ দিনের ভরা অগ্রিম বুকিং থাকে। সেই অগ্রিম বুকিং এবার নেমে এসেছে ৫-৬ দিনে। মাদারিহাটের বিভিন্ন বেসরকারি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ হা-হুতাশ করছেন। কর্মচারীদের সম্বৎসর বেতন দেবেন কীভাবে, সেটাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। একই রকম ভয়াবহ পরিস্থিতি মূর্তি আর বক্সায়।

পর্যটন শিল্প হল অর্থনীতির সুখের পায়রা। যখন দেশের বা রাজ্যের অর্থনীতি ভালো থাকে তখন পর্যটনে জোয়ার আসে। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের মতো বুনিয়াদি সার্ভিস সেক্টর পর্যটন নয়। যখন হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তখনই মানুষ পর্যটনের কথা ভাবে। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক শান্তি ও নিরাপদ ভ্রমণের নিশ্চিন্ত আশ্বাস পর্যটন বিকাশের প্রধান কতকগুলি শর্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগের প্রাদুর্ভাব পর্যটন শিল্পকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর-এর সদ্য টাটকা অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। ২০০৮-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পকে দিয়েছিল জোর ধাক্কা। সেই ইতিহাসও স্মরণে রাখতে হবে।

গোটা পৃথিবীর, তার সঙ্গে দেশের অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। উপরন্তু এর সঙ্গে যোগ হয়েছে চিটফান্ডের বিপুল অর্থ উধাও হয়ে যাওয়া। সমস্ত চিটফান্ড মিলিয়ে কেউ বলছেন ২০ হাজার কোটি, কেউ বলছেন ৫০ হাজার কোটি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। এর রাজনৈতিক তরজায় না ঢুকেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এটা এই গরিব রাজ্যের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি বেহাল। রাজ কোষাগার শূন্য। বিগত সরকারের ঋণ ও সুদ মেটাতে জেরবার হয়ে সরকার আরও ঋণ করছে। ফলত রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পুরকর্মী সকলেই (প্রায়) ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর এঁরাই হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গীয় পর্যটকদের প্রধান অংশ। ফলে সাধারণ ভ্রমণার্থীরা বেড়াতে যাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকের উপর নির্ভর করে থাকে গোটা ভারতবর্ষের বহু জায়গার পর্যটন। সেইসব জায়গাতেই লেগেছে মন্দার ছোঁয়া।

এই সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে গোটা রাজ্যের পর্যটন শিল্প বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ২০১২-১৩-র তুলনায় ২০১৩-১৪-র মরশুমের ব্যবসায় ছিল ভাটার টান। আর ২০১৪-১৫-র অবস্থা সঙ্কটের আকার নিয়েছে।

কিন্তু ডুয়ার্সের এবারের সঙ্কটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সেপ্টেম্বরে শেষ আর অক্টোবরের শুরুতে এবার পুজোর ছুটি। ৬০ দিন আগে ট্রেনের অগ্রিম বুকিং হয়। অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষ এবং আগস্ট মাসের শুরুতেই সবাই ট্রেনের টিকিট কাটছিলেন। সেই সময়টা জুড়ে সমস্ত

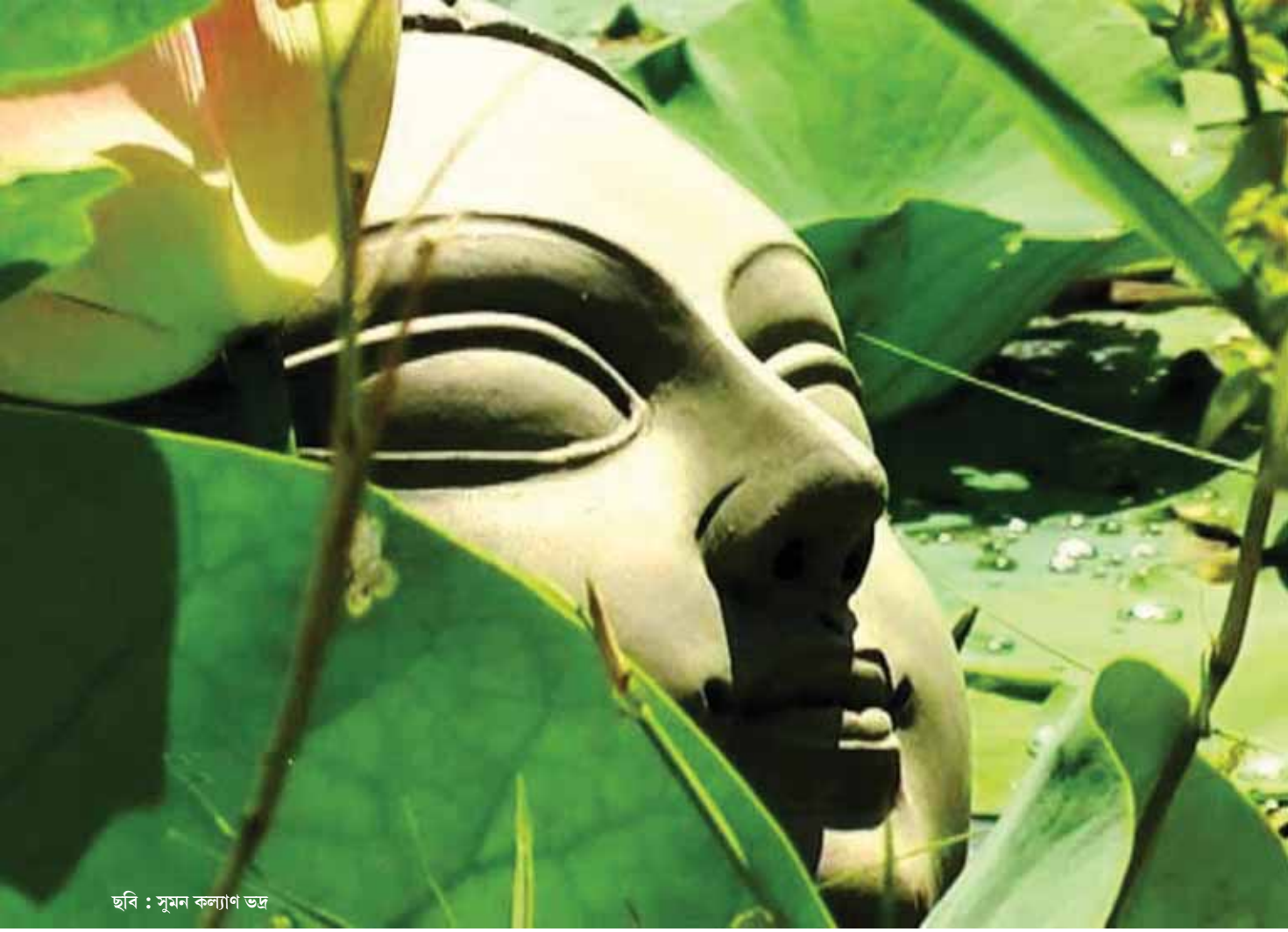

ছবি : সুমন কল্যাণ ভদ্র

সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলে একটাই খবর বার বার শিরোনামে এসেছে, ব্রেকিং নিউজ হয়েছে। সেটা হল ডুয়ার্সে জাপানি এনকেফেলাইটিসের মড়ক।

প্রতি বছরই ডুয়ার্সে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিছু প্রাণ অকালে ঝরে যায়। অবশ্যই পৌরসভা, পঞ্চায়েত ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অযোগ্যতা এবং গাফিলতি রয়েছে। আগেও ছিল, এখনও আছে। এবার রোগের প্রাদুর্ভাব জুলাই ও আগস্টের গোড়ায় বেশি বেশি ছিল। সরকারের গাফিলতি অবশ্য ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে বর্ষার অপ্রতুলতা ছিল এর অন্যতম কারণ। আগস্টের প্রবল বর্ষায় স্বাভাবিকভাবেই এই রোগের প্রকোপ কমে যায়। কিন্তু মিডিয়া যেভাবে এই খবরটি নিয়ে প্রচার শুরু করল তাতে মনে হচ্ছিল গোটা ডুয়ার্সে ঊনবিংশ শতকের কলেরা বা প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। মিডিয়া জগতে বলাই হয়, খারাপ খবরের মতো ভালো খবর আর কি কিছু হয়? পুজোর ঢাকঢোলের বিপুল আওয়াজে যেমন চাপা পড়ে পায় বলিপ্রদত্ত ছাগশিশুর করুণ আর্তনাদ, তেমনই প্রচারের বলি হয়ে গেল ডুয়ার্সের এবারের পর্যটন সম্ভাবনা।

ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের সময় বহু স্কুল, হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। প্রাণ গেছে প্রচুর অসামরিক সাধারণ মানুষের। নিষ্ঠুর মার্কিন যুদ্ধের পরিভাষা এই মানব জীবনের বিপুল অপচয়কে বলেছে— 'কোল্যাটেরাল ড্যামেজ'। এই শব্দবন্ধের আড়ালে ঢাকা পড়েছে হাজার হাজার মানুষের জীবন।

৯০-এর দশকের শেষ দিকে ডুয়ার্সে ছিল কে এল ও র দাপট। এর রাজধানী ছিল আমার গ্রাম, কুমারগ্রামদুয়ার। খবর কাগজে, টিভিতে এমন প্রচার হয়েছিল যেন কুমারগ্রামদুয়ার প্যালেস্টাইনের গাজা। অথচ গ্রামের স্বাভাবিক জীবন মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল।

এবারের এনকেফেলাইটিসের উপদ্রব ছিল প্রধানত শহুরে বস্তি এলাকায় এবং সেইসঙ্গে কিছু চা-বাগানে এর প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রধানত যেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে শুয়োর পালন হয় সেই অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল। কোনও মিডিয়া এই কথাটি খোলসা করে বলেনি। আর সেটা তুলে ধরে এও বলেনি যে, পুজোয় ডুয়ার্সে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন। বরঞ্চ একটি মিডিয়া আবার ফরেস্ট ম্যালেরিয়ার গল্প এমনভাবে পরিবেশন করল যেন এ একটা নতুন সমস্যা। যে কোনও নিরক্ষীয় জঙ্গলে এই রোগ চিরকাল আছে। এটা চিকিৎসাযোগ্য। শুধু তাই নয়, এই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কলকাতা শহরেও যথেষ্ট। খবরকে চাঞ্চল্যকর করতে গিয়ে তাকে বিকৃত করার পন্থা যে কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে, সেই বিচার এখনকার মশলাদার মিডিয়া আর করে না। সকলের বিচারের ভার স্বেচ্ছায় মিডিয়া নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। তারাই বিচার করেছে। এবারের ডুয়ার্সের পর্যটন নিশ্চিতভাবেই মিডিয়ার কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের কোল্যাটেরাল ড্যামেজ।

তাপস বরণ চন্দ

প্রথমবারের পুজো হয় মালগাড়িতে
বানারহাটের মেলা

বানারহাটে প্রথমবার পুজো হয়েছিল এখানকার স্টেশন মাস্টারের উৎসাহে। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় রেল ওয়াগনে। ক্রমে সেই পুজোকেই কেন্দ্র করে মেলার পত্তন। কালের সর্পিল পথ বেয়ে সেই বানারহাটের মেলা আজও ডুয়ার্সের পুজোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

বানারহাটে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এক বিশাল মেলার আয়োজন হয়, লক্ষাধিক দর্শনার্থী মেলায় অংশগ্রহণ করেন। মেলা অর্থে মেলামেশার স্থান, এককথায় মিলনকেন্দ্র। জনসমাগমের অন্তরালে সামগ্রিক মানসিক শুদ্ধতা, আত্মতৃপ্তি এবং বিনোদনকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াই মেলার মূলমন্ত্র। বাংলায় (দুই বাংলাকেই ধরা যেতে পারে) মেলা-অনুষ্ঠান প্রকৃতই প্রাণবন্ত। হিসেব নিতে গেলে এর সংখ্যা একেবারে কম হবে না। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মেলার তালিকা তৈরি করতে না পারলেও ২/১টির উল্লেখ করাই যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করি শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার কথা, যার সূত্রপাত ঘটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে। দেশজুড়ে এই মেলার ঢেউ ওঠে। কেন্দুবিল্বতে হয় জয়দেবের বাউল মেলা। মকর সংক্রান্তির দিনে বাউলের আখড়া বসে। সাধন-ভজন আর বাউল সম্প্রদায়ের ঐশ্বরিক কণ্ঠের বাউল গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে চারপাশ। অজয় নদের তীরে তীরে তা গড়ে তোলে সুর-মূর্ছনা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত ছেড়ে এগিয়ে আসি উত্তরের দিকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটে বর্ধমানের জমিদার হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার বোল্লাকালীর পুজো শুরু করেছিলেন। সেই পরম্পরায় এখনও ৪৫০০টি ছাগশিশু বলি দেওয়া হয় এখানে। অসহায় প্রাণের কান্না, হাহাকার, বাঁচার শেষ চেষ্টায় ব্যর্থতা, সবকিছু নিমেষে শেষ হয়ে যায় ভক্তদের এই উল্লাসে। পুণ্য আদৌ কি পূর্ণতা পায়? ছাগশিশু, সেও তো শিশু, সেও তো প্রাণ। কোচবিহারে হয় রাসমেলা। কোচবংশীয় নৃপতির কূলদেবতা মদনমোহন জিউয়ের রাস উৎসব। লক্ষাধিক দর্শনার্থী এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে, এমনকী কাশ্মীর থেকেও কাশ্মীরিরা শিল্পদ্রব্য এবং উল-পশমের তৈরি কারুকার্যশোভিত বস্ত্র সম্ভার নিয়ে হাজির হত কোচবিহার রাসমেলায়। একথা অবিদিত নয় যে, ডুয়ার্স তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রকৃতই অত্যন্ত দুর্বল ছিল। মানুষকে মূলত নির্ভর করতে হত গোযান অথবা পদব্রজে যাতায়াতে আর যেখানে রেলগাড়ির সুবিধা রয়েছে সেখানে রেলগাড়িতে। একথা অনস্বীকার্য যে, যাতায়াতের অসুবিধার কারণে জনগণকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্ভার, শীতকালীন পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অনেকটাই নির্ভর করত এইসব মেলার উপর। এইসব মেলায় আগমনের একটি দিক ছিল যেমন প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ, সেইসঙ্গে বিনোদনের টান ছিল আর একটি দিক। গ্রাম্য মেলার শান্ত পরিবেশ—শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী এবং বাড়ির কর্তাকর্ত্রীর মনে বুলিয়ে দিত স্নিগ্ধতার পরশ। সার্কাসের কলাকুশলীদের কসরত এবং জীবজন্তুর প্রদর্শন মন জয় করে নিত অগণিত দর্শনার্থীর।

হ্যামিলটনগঞ্জের কালীপুজা উপলক্ষে বিশাল মেলা সমগ্র ডুয়ার্সের জনগণকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। সারারাতব্যাপী সার্কাস ও নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে চা-বাগানের অধিবাসীরা ঝাঁকে ঝাঁকে অংশগ্রহণ করে থাকে। সেইসঙ্গে থাকে কেনাকাটার ব্যাপারটাও। বিশেষ করে শীতবস্ত্র, সৌখিন দ্রব্যসমূহ সংগ্রহের দিকটা বিশেষ মাত্রা পেয়ে থাকে। হৈহুল্লোড়ে রাত কেটে যায়।

হুজুর সাহেবের মেলা বসে হলদিবাড়িতে। দেশ এবং বিদেশ থেকে অগণিত দর্শক, বিশেষ করে বাংলাদেশের নাগরিকরা হাজির হয় এই মেলায়। মূলত মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষ এ মেলায় অংশ গ্রহণ করে।

বানারহাট মেলার প্রসঙ্গ তোলার পূর্বে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে। পাঠকবর্গ বিব্রত বোধ করবেন না। পূর্বে বানারহাট থেকে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে দুর্বল ছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে বেঙ্গল

ডুয়ার্স রেলওয়ের কল্যাণে রেলপথ স্থাপিত হল। যার সমাপ্তি ঘটেছিল চতুর্থ রেলস্টেশন মাদারিহাটে। তারপর ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকেও যাবতীয় প্রসাধনী, মনোহারি দ্রব্য সমূহ, নানাবিধ আধুনিক রুচিসম্মত পোশাক, শীতবস্ত্র, খেলনা, জুতো, কাঠের আসবাবপত্র এবং স্বর্ণালঙ্কারের বিশাল সম্ভার নিয়ে দুর্গাপুজোর বেশ কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেন রেলস্টেশনে এসে দাঁড়াত। বর্তমান ভাষায় চলমান ডিপার্টমেন্টাল মল। অনেকগুলি কামরা। কামরায় এক দরজায় ওঠা এবং অন্য দরজায় নামার ব্যবস্থা। কামরার ভিতরে বসার বেঞ্চ তুলে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা শোকেস— নানাবিধ দ্রব্য সম্ভারে ঠাসা। শোকেসের একপাশে বিক্রেতা বা তাদের প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে। ;ক্রেতাবৃন্দ ট্রেনের কামরায় উঠে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করে অন্য দরজা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। স্টেশন চত্বর লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের ঠাঁই নাই। পুজো উপলক্ষে রুচি অনুযায়ী জিনিস স্পেশাল ট্রেনেই পাওয়া যেত। পৃথক কামরায় আলাদা আলাদা দ্রব্যসমূহ। এও এক মেলার রূপ নিত। ২/৩ দিন থাকার পর সূচি অনুযায়ী পরবর্তী স্টেশনের দিকে চলে যেত এই ট্রেন। সমগ্র অঞ্চল কালো অন্ধকারে ঢাকা। তার মাঝে ২/৩ দিন রেলগাড়ির কামরার আলো, আগেকার দিনের কম পাওয়ারের বাল্ব। তবু দূরে দূরে লণ্ঠনের মৃদু আলোর মাঝে সেই রেলগাড়ি যেন ঝকঝকে আলো-ঝলমল মেলার প্রতিবিম্ব।

পূর্বতন বঙ্গদেশের বিভাজন ঘটিয়ে সৃষ্ট হল পশ্চিমবঙ্গ, অপর অংশ বর্তমানের স্বাধীন গণতন্ত্রী বাংলাদেশ। বিভাজনের আগে উত্তরের গোটাটাই ছিল নদীমাতৃক অঞ্চল। এখন যা ওপার বাংলা, মেলার দাপট সেখানেও কম নয়। সব ঋতুতেই মেলা, তবে দুর্গাপুজার সময় যে মেলা তা অসামান্য। নদীপথে যাতায়াত, স্থলপথেও যানবাহনের ব্যবস্থা বর্তমান। নানা ধরনের দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ মেলা চত্বর। শীত পড়া পড়া ভাব, ফলে খেজুরের পাটালি-নলেনগুড় সবই মেলায় উঠেছে। কেনাকাটার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। উল্লেখযোগ্য ঘটনা নৌকা বাইচ। বিশাল নদী, নদীবক্ষে ৫০/৬০ হাত লম্বা নৌকা। বিশ-পঁচিশ জন করে মাল্লা, এ রকম ৬/৭ খানা নৌকার বাইচ প্রতিযোগিতা। অনিবার্যভাবে উত্তেজনা নদীর দুই পাড়ের অগণিত দর্শকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত।

ফিরে আসি বানারহাট দুর্গাপূজার মেলার কথায়। সার্বিক মেলামেশার পীঠভূমি। চা-বাগান পরিবেষ্টিত। তাই আশপাশের চা-বাগানের লোকজন দলে দলে এই মেলায় যোগদান করে। নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার, সৌখিন জিনিসপত্র, প্রসাধনী, তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যও মেলায় আমদানি হয়। ডুয়ার্স অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বানারহাট মেলা সমধিক আকর্ষণীয়। স্থানীয়ভাবে তো বটেই, বলা যায় সর্বভারতীয় ছোঁয়ার স্পর্শও সেখানে অনুভূত হতে শুরু করেছে। যদিও বর্তমানে মেলার স্থান সংকুলান ধীরে ধীরে সমস্যার সৃষ্টি করছে। পূর্বে জায়গার কোনও সমস্যাই ছিল না। পুজো প্রাঙ্গণ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে ভাটফুলের গাছ-সমন্বিত বিশাল প্রান্তর ছিল। ওই প্রান্তরে ফানুস ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল।

বানারহাটে পুজো দেখতে আসার এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করি। পূর্বেই বলেছি বানারহাট যাতায়াতের অসুবিধা তো ছিলই। বীরপাড়া অঞ্চল থেকে বানারহাট আসতে হলে গয়েরকাটা হয়ে চামুর্চি মোড় দিয়ে যাতায়াত করতে হত। বানারহাটের পুজো এক অমোঘ আকর্ষণ। বাগানের বড়বাবুর একখানা ট্রাক ছিল, সেই ট্রাক বাগানের সব পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রওনা হল গয়েরকাটা হয়ে বানারহাট। মরাঘাটে লেবেল ক্রসিংয়ের পর একটি ছোট সেতু পার হতে হয়। সেতুটা সংকীর্ণ এবং তীক্ষ্ণ বাঁকের মুখে। ড্রাইভার ওই পর্যন্ত আসার পর বেঁকে বসল। ওই ছোট্ট সেতু দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। নানাভাবে বুঝিয়েও তাকে রাজি করানো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে বড়বাবু ধমক দিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললেন, আর গাড়ি থেকে শিশু, মহিলা সহ সবাই নেমে গেল। ড্রাইভার সেতু পার করতে অনেকটা সময় লাগাল, আমরা একটু বেশি রাতের দিকে বানারহাট মেলায় পৌঁছলাম। তখনও মেলা জমজমাট। পুজোর মণ্ডপের দক্ষিণ কোণে কয়েকজন যুবক ফানুস ওড়ানোর জন্য মশাল জ্বেলে ফানুসের খোলের ভিতর তখন ধোঁয়া দিতে ব্যস্ত।

মেলায় এত আড়ম্বর, এত উচ্ছ্বাস, এত উৎসাহ, তার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু দুর্গাপূজা। স্বভাবতই মনে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে, কবে কীভাবে শুরু হল বানারহাটের দুর্গাপূজা? রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে দুর্গাপূজা হত। সেটাই অনুপ্রেরণা কি না তা বলা কঠিন। তবে বানারহাট চা-বাগান পরিবেষ্টিত কয়েক ঘর বঙ্গসন্তান বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে বসবাস করতেন, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কয়েকজন রেল কর্মচারী। অবশ্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও বসবাস করতেন এই অঞ্চলে। স্টেশন মাস্টার ছিলেন চণ্ডীচরণ কুণ্ডু। কর্তব্যপরায়ণ এই ভদ্রলোক উৎসাহী এবং হুজুকপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁরই উৎসাহ এবং সদর্থক ভূমিকার ফল বানারহাটের দুর্গাপূজা। কীভাবে ব্যবস্থা করেন সঙ্গে আর কে কে সহযোগিতা করেছিলেন, সে তথ্য পাওয়া কঠিন। তবে তিনি বাইরে কোথাও প্রতিমা তৈরি করিয়েছিলেন, কেননা বানারহাটে সে সময় এর সম্ভাবনাই ছিল না এবং মালগাড়ির মধ্যেই পুজো হয়েছিল। পুজো শুরু হল বানারহাটে এবং তাকে ঘিরে অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি সে সময়ের বসবাসকারীদের। পরবর্তীতে পুজো স্থানান্তরিত হল সেই সময়কার পোস্টমাস্টার রাধাগোবিন্দ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়। স্থান নির্বাচন হল বানারহাট বাগানের ডাকঘরের সামনে। ক'বছর এখানে হয়ে বানারহাট বাগানের চিকিৎসক ডাঃ বিনোদ সরকারের উদ্যোগে দুর্গাপূজার স্থান পরিবর্তন ঘটে। পিডব্লুডি অফিসের সামনে পুজোর স্থান নির্বাচন হল। এখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতে পুজো উদ্যোগীরা পুজো সরিয়ে নিয়ে এলেন পূর্ব বানারহাট হাটখোলায়। অতঃপর পুজোর স্থান নির্বাচন হল হাইস্কুলের সামনে। বর্তমান সময় পর্যন্ত স্কুলের সামনেই দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট মেলার আয়োজন।

ডুয়ার্স অঞ্চলে বাগিচা শিল্প গড়ে ওঠার পর পরই দুর্গাপুজোর সূত্রপাত ঘটেনি। বেশ কিছুকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে কোনও না কোনও ঘটনার সূত্র ধরে দুর্গাপুজো হতে আরম্ভ করে। ধারাবাহিক বিবরণ হয়তো তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে দেওয়া সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও দু'-একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। মূলত বঙ্গসন্তানগণ এই অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন, বর্তমানে তা সর্বজনীন— জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক সামাজিক অনুষ্ঠান। ডুয়ার্সেপুজোর সূত্রপাতের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় বীরপাড়া দুর্গাবাড়ির পুজোর কথাও। কয়েকজন বঙ্গতনয়, যাঁরা জীবিকার সন্ধানে থিতু হয়েছিলেন বীরপাড়ায়, দিনের শেষে বিনোদনের উদ্দেশ্যে লণ্ঠনের মৃদু আলোতে আধো অন্ধকার পরিবেশে তাঁদের সময় কাটানোর জন্য ছিল কেবল তাসখেলা। তারই

মাঝে কথাবার্তার ফাঁকে কেউ একজন উত্থাপন করলেন দুর্গাপুজোর করার কথা। অতঃপর বন্ধুরা এক-একজন প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নিয়ে শুরু করলেন দুর্গাপুজো, সেটা ১৯৩৬ কিংবা ১৯৩৭ সালের কথা। প্রথম পুজোতে খরচ হয়েছিল সর্বমোট ৭৫ টাকা।

গয়েরকাটায় থাকতেন কয়েক ঘর বঙ্গসন্তান। কোথা থেকে জটাজুটধারী এক সাধুর আবির্ভাব ঘটল। আস্তানা গাড়লেন মোটর মেকানিক সর্দার সুখা সিংয়ের কর্মশালায়। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, দুর্গাপুজো করতে হবে। সর্দার সুখা সিংয়ের কর্মশালায় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হল। আর একটি চমকপ্রদ বিবরণ উল্লেখ করি। কী করে হল তাসাটি চা বাগানের দুর্গাপুজো। তাসাটিতে কারখানায় কাজের শেষে ছুটির দিনে কর্তৃপক্ষ কারখানার সকল কর্মীকে এক কাপ বিলিতি সুরা পান করতে দিত, সুরাপান শেষে ৭৫ পয়সা বখশিস দেওয়া হত। বাগানের কর্মচারীবৃন্দ এবং শ্রমিক প্রতিনিধি যৌথভাবে ইংরেজ ম্যানেজারের কাছে আবেদন করে, বিলিতি সুরা এবং বখশিস বাবদ যে খরচ হয়, সেই টাকা দুর্গাপুজোর জন্য দেওয়া হোক। দীর্ঘ আলোচনার পর দুর্গাপুজোর জন্যই কর্তৃপক্ষ টাকা দেওয়া শুরু করল শারদোৎসবে।

বানারহাটের দুর্গাপুজোর মেলায় এ অঞ্চল তো বটেই, ডুয়ার্সের অন্য অঞ্চল থেকেও বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। জমজমাট মেলা, নানাবিধ পশরা, নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান— স্বভাবতই এ অঞ্চলের বাসিন্দারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্য।

গত বছর বৃষ্টির জন্য পুজো প্রাঙ্গণ এবং মেলা অঞ্চল কাদায় কাদায় একাকার হয়েছিল, তা সত্ত্বেও জনস্রোতের কমতি ছিল না। মেলা চত্বর থেকে বার হয়ে এলে বেশভূষার অবস্থা দেখেই বোঝা যেত যে, কতটা কাদার স্তর পার হতে হয়েছে। জামাকাপড় কাদায় লেপটে একাকার।

এক দম্পতি মেলায় ঘুরতে এসেছে। যুবকের পরনে হালফ্যাশনের জিনস্, পায়ে ফিতেওয়ালা বুটজুতো, যুবতীর পায়ে বেল্ট-লাগানো ফ্যান্সি জুতো আর পরনে জর্জেট শাড়ি। কোলে ছোট শিশু। চলতে চলতে হঠাৎ যুবতীর জুতো কাদায় আটকে গেছে। আর্তস্বরে স্বামীকে বলছে— কাদায় পা আটকে গেছে, কী করব? স্বামী পরামর্শ দিল— হেঁচকা টান লাগাও, 'নিকাল যায়েগা'। হেঁচকা টান দিতে পা উঠে এল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণ নতুন শখের জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। কান্নাভেজা গলায় যুবতী বলছে, 'ময় কেইসে মেলা ঘুমব?' স্বামীটা বলছে, 'রোক রোক'। পায়ের বুটজুতো খুলে এগিয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। মেয়েটাও অনায়াসে পরে নিল বুটজুতো। শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। যুবক ততক্ষণে স্ট্র্যাপ ছেঁড়া কাদামাখা জুতো হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। মেয়েটি দারুণ খুশি, বলল 'চল্ মেলা ঘুরভি'। ভিড়ে মিশে গেল সুখী দম্পতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার— *অরুণ কুমার বসু, প্রয়াত শ্যামাপদ গুহ (বীরপাড়া) এবং প্রয়াত মাস্টারদা (গয়েরকাটা)*

ব্রজগোপাল ঘোষ

চা বাগিচায় দুর্গাপুজো

ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে ঘুরে ঘুরে পুজো দেখার স্বাদই আলাদা। সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে দশভূজার পুজোর আয়োজনও যেন অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে যায়। কোনও কিছুই বেমানান লাগে না। এই কটা দিন ঘন সবুজের দেশে বাঙালি-নেপালি-ভুটিয়া-মদেশিয়া সব মহানন্দে মিলেমিশে একাকার। ধুঁকতে থাকা চা-বাগানও এই কটা দিন তার বিবর্ণতা ভোলে।

বলো বলো দুর্গা মাই কি জয়। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সেরা উৎসব। সারা বছর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা। আবার কবে? বছর পরে। ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকার পাতা উলটে দেখা পুজোর তারিখ। পুজো আসছে, আগমনীর আনন্দে আজও রোমাঞ্চ জাগে। শৈশব, কৈশোরে মনে হত, মা দুর্গা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা মাস তো কাটিয়ে যেতে পারেন। তা কি আর হয়! চারদিন বাদেই বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। তবু ভক্তদের আকুল প্রার্থনা আবেদনে মা ক'টা দিন এক্সটেনশন করেন। শেষ পর্যন্ত মর্ত্যের পুলিশ এসকর্ট করে কৈলাসের পথে নিয়ে যায়। পুজোমণ্ডপ খাঁ খাঁ করে। কলাগাছ গোরুতে টানে, এককোণে মিট মিট জ্বলে ঘিয়ের প্রদীপ। আড়ম্বর, জৌলুস ভ্যানিস। পুজোর আনন্দ কার কাছে কেমন জানি না, আমি মেতে উঠি বেড়ানোর হিসেব নিয়ে। বাইরে দূরে, কিংবা দুয়ার হতে অদূরে কয়েকটি দিন চেনা মিছিলের বাইরে যাতে কাটিয়ে আসা যায়। ঘরবন্দি হয়ে থাকবার বান্দা আমি নই। যৌবনে মারদাঙ্গা করে রেলকামরায় ওঠা, ভিড়, ঠেলাগুঁতো-গালিগালাজ, তারপর প্রেম-মহব্বত— এই না হলে বিবিধের মাঝে মিলন! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেলকুলির দ্বারা শেষপর্যন্ত আসনের ব্যবস্থা হয়ে যেত। থাকা সস্তার লজ-হোটেল, না হলে ধরমশালায়। ভোজনং যত্রতত্র, ফুটপাত, না হলে ঝুপড়ি-ঝাপড়ায়। পেটে কিছু দানাপানি দেওয়া। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের দাপাদাপি যেন কমে আসে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, এখন বিদেশেও বাঙালির পুজোয় বেড়ানো তুঙ্গে। হোটেল, লজ, রিসর্ট, বাংলো,

মায় তাঁবু। একচিলতে বারান্দাও খুঁজে পাবেন না। সর্বত্র হাউসফুল। কয়েক বছর আগে সস্ত্রীক পুরীতে দুর্গাপুজোয় বেড়াতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেতে হয়। পায়রার খোপে থাকা। লাইন দিয়ে বউদি, ঠাকুমার হোটেলে খাওয়া পোষায় না। যে কেমন পারছে ঝোপ বুঝে কোপ মারছে।

তাই এখন পুজোর ছুটিতে বেশি দূরে নয়। আজ বেড়ানো মানে দুয়ার হতে অদূরে বেরিয়ে পড়া। কয়েক বছর আগে ডুয়ার্সের চা-বাগিচা ঘুরে ঘুরে সৌন্দর্যসুধা পানের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি, তাতে এক আলাদা অনুভূতি জাগে। লাটাগুড়ি থেকে পরান বাবাজির অনুরোধ, 'গৌরীদা, চলে আসুন। আপনাকে নিয়ে কয়েকটি চা-বাগানে বেড়িয়ে আসব। থাকবেন নাগরাকাটার সুলকাপাড়ায় আমার সাধনকুঞ্জে। ঢাকের বাদ্যি, কাঁসর-ঘণ্টা, মাইকের শব্দ, কিছুই থাকবে না। গরুমারা, মূর্তি, চাপড়ামারি, এমনকী লাটাগুড়ির সমস্ত রিসর্ট কলকাতার বাবু-বিবিরা আগাম দখল করেছেন। পরানের পরামর্শে ঝোলা কাঁধে সটান নেমে পড়ি চালসার চৌমাথায়, তারপর লাটাগুড়ি। পরানকে বগলদাবা করে রওনা হই সুলকাপাড়ায়। যাওয়ার পথে মাথাচুলকা গ্রামে এক মাতব্বরের সঙ্গে দু'-চারটে বাক্যবিনিময়। চালসায় থামাথামি নয়, জঙ্গল, জাদুপাহাড়, জলঢাকা পার হয়ে সুলকা মোড়। পরানের আরদালি নটবর সিং ঘর খুলেই রেখেছিল। একটু চা-পান, স্নানটান সেরে দুটো ডালভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়া। যাত্রাপথে ছড়ছড়িয়াবাবুর অনুরোধ, সন্ধ্যাবেলায় যেন চায়ের আসরে উপস্থিত থাকি।

নাগরাকাটা চা-বাগানের পুজোমণ্ডপে একটু ঢুঁ মেরে আমরা চলে আসি হিলা চা-বাগানে। চা-বাগানে বাবু, শ্রমিকরা আনন্দে মশগুল। চা-পাতা বহনের ট্রাকে চেপে পুজো দেখতে বেরিয়েছে। পুজোর বোনাস, পাওনাগণ্ডা মিটে গেছে। চা-বাগানের গুদরিহাট, বড় হাট তুঙ্গে। তোলো হাঁড়িয়ার তুফান। কিস্তিতে কেনার সুবর্ণসুযোগ, কেবল্ লাইন ঢুকে গেছে, না হলে ডিশ অ্যান্টেনা তো আছে।

বিনোদনের নানা বৈদ্যুতিন উপকরণ চা-বাগানে ঢুকে পড়েছে। যার যেমন সাধ্য মণ্ডপ সাজিয়েছে। শহরের মতো জমকালো নয়, আলোর রোশনাই, ব্যয়বহুল প্রতিমা কেনা, ডেকরেশন নেই ঠিক, তবে প্রাণ আছে। চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবনে পুজোর আনন্দ পুরোমাত্রায় জমে ওঠে। সবটাই নির্ভর করে বেতনপত্র, বোনাস পাওয়ার ওপরে। যেসব চা-বাগানে বোনাস হয়নি, বাবু-শ্রমিকদের ট্যাঁকে পয়সাকড়ি নেই, সেখানে পুজোর আনন্দ ফিকে, বিষাদপূর্ণ। দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলতেই থাকে। শ্রমিক নেতারা বিপাকে পড়ে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

হিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। সরকার পরিচালিত বাগান। চম্পাগুড়ি, যমুনা মোড়, চা-গবেষণা কেন্দ্র থেকে থালঝোরা, জিতি নয়াসাইলি, হোপ চা-বাগানের পুজো দেখে আমরা আসি কুর্তি চা-বাগানের পুজোমণ্ডপে। তার আগে দুদণ্ড বিশ্রাম চা-বাগানের মন্দিরে। শ্বেত পাথরের তৈরি মন্দিরের বারান্দায় বসে দূরে ঘাটিয়া, লুকশান চা-বাগানের বিহঙ্গ দৃশ্য দেখি। যেখানে যাই পরানের পরিচিত এ বাবু, সে বাবু, বউদি, কাকিমা, জেঠিমা, ঠাকুমা, ছেলেমেয়েদের ডাকাডাকি। প্রসাদ নিতেই হয়। একদা বাবুরা পুজোর ছুটিটা চা-বাগানেই কাটাতেন। এখন শহুরে আকর্ষণ বেশি। কোয়ার্টারে তালা ঝুলিয়ে আপন ঘরবাড়িতে চলে যান। দু'-একজন বাবুর কথা আলাদা।

চা-বাগানের সেই চার্ম কোথায়! কারও দাদু এসেছিলেন ডানকান সাহেবের আমলে যখন যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতো ছিল না। বাগানেই বাবুরা গড়ে তুলেছিলেন লাইব্রেরি। কত বই ছিল। পুজোর আগে নাটকের মহড়া হত। আবৃত্তি, নাচগান, কত কী! ভালোমন্দ খাওয়া তো ছিলই। পারস্পরিক মেলামেশা ছিল পরম আত্মীয়ের মতো। এখন চা-বাগানে চাকরি অনিশ্চয়তার মধ্যে। শ্রমিকদের বিস্তর সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত করছে মালিক। সেসব আলোচনা করতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলব।

সারাটা দিন এ বাগান সে বাগান ঘুরে বিকেল নাগাদ কুর্তি হয়ে ঢুকি ভগৎপুরে। নাগরাকাটা রেলস্টেশন, বাসস্টপ থেকে হাঁটাপথ। বাজারে এক বিহারির দোকানে চা খেয়ে গ্রাসমোরে যাই। সেখানেও হাঁকডাক, রাতে থাকুন। মহাভোজের আসরে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। ড্যাডাং ড্যাডাং ঢাক বাজছে। প্রজাপতির মতো ছেলেমেয়েরা যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। মণ্ডপে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে আসি পরানের সাধনকুঞ্জে। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় একটু টান হয়েছি, এমন সময় গয়েরকাটার ব্রজদার ফোন, 'আগামীকাল মহাষ্টমী। যেখানেই থাকুন সকালে আসুন। গাড়ি রেডি। আশপাশের চা-বাগানে পুজো দেখে মধুনবী, খুন্টিমারি হয়ে ফেরা। রাতে আমার কোয়ার্টারে থাকবেন। আসা চাই।'

আংরাভাসা নদী, সবুজে সবুজ গয়েরকাটা। ততোদিক বিস্ময়ের জাতীয় সড়কে শতাব্দীপ্রাচীন কড়ি গাছের সমারোহ। সকাল নটায় নাগরাকাটা থেকে গয়েরকাটা পৌঁছে যাই। বাসস্টপ থেকে দুপা হাঁটলে গয়েরকাটা চা-বাগান রিক্রিয়েশন ক্লাব। শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠ, প্রায় একই ধরনের সারি সারি কোয়ার্টার। পুরুষ, মহিলা, শিশুদের ভিড়। বারান্দায় ব্রজদা দাঁড়িয়ে। পৌঁছতেই ব্রজদার অনুরোধ, এখানে বেশি বিলম্ব করা ঠিক হবে না। গরম গরম লুচি, তরকারি, মিষ্টি নিয়ে এল ব্রজদার কন্যা। তারপর চা। গয়েরকাটা নিয়ে স্নেহভাজন অমিত দে সুন্দর ছড়া লিখেছিল 'মাতলো রে ভুবন'-এ—

'আংরাভাসা নদীর কথা গয়েরকাটা শোনেক্ষ্ম
নীল আকাশে একটি মানুষ নীলাম্বরী বোনে।'

ওই একটি মানুষ কে জানেন? আমাদের প্রিয় ব্রজগোপাল ঘোষ। আজও এই বয়সে ব্রজদার উৎসাহে তিলমাত্র ভাটা পড়েনি। ডুয়ার্সের চা-বাগানের সমাজ-সংস্কৃতি, সুখ-দুঃখের পাঁচালি ব্রজদা গড়গড়িয়ে বলতে পারেন। পুজোর আগে 'মাতলো রে ভুবন' প্রকাশিত হয়। গয়েরকাটা চা-বাগানের ছেলে সমরেশ মজুমদার, কবিতায় চিরযুবক তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়— সামচির ভুটানি মেয়ে যে এসেছিল গয়েরকাটা। গয়েরকাটার কবি বিকাশ সরকার গুয়াহাটি থেকে চলে এসেছে ছুটির নিমন্ত্রণে।—'গৌরীদা কতকাল পর দেখা হল বলুন তো?' দেরি না করে ব্রজদার সঙ্গে চেপে বসি মারুতি ভ্যানে। গয়েরকাটা চৌমাথা। ডানদিকে এথেলবাড়ি, বিন্নাগুড়ি, ক্যান্টনমেন্ট মোড় ছুঁয়ে বীরপাড়া। বাঁদিকে খুন্টিমারি জঙ্গল, দুরামারি, ডাউকিমারি, নাথুয়া, কলাবাড়ি, মোগলকাটা, তোতাপাড়া, গ্যাদরাপাড়া হয়ে বানারহাট। পেছন ঘুরলে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি। আমরা সোজা পথ ধরে প্রথমেই যাব হলদিবাড়ি চা-বাগানে। গাড়ি থেকে নামামাত্র বাবুরা হইচই করে ব্রজদাকে জাপটে ধরে— এতকালে আমাদের মনে পড়ল ব্রজদা? আমি ভ্রমণসঙ্গী। চিনি না কাউকে। কিন্তু ব্রজদা বিবিধ বিশ্লেষণে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পরিচয় এমন করে তুলে ধরেন যেন বিখ্যাত পরিব্রাজক লেখক। মহাষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হয়ে গেছে, পুরুতমশাই নামাবলি গায়ে ঘণ্টা নাড়ছেন। ধূপধুনোর গন্ধে ম-ম করছে। সেই সঙ্গে মিশেছে নানা রকম পারফিউমের গন্ধ। আলোচনা

হচ্ছে—আমার বর দিয়েছে জামদানি। মেয়েলি কথাবার্তার মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু শাড়ি। মহিলা মহলের ভিড় লক্ষণীয়। শিশু-কিশোরদের ছোটাছুটি, বাজিপটকা ফাটাচ্ছে। একজন বাবুমশাইয়ের কোয়ার্টারে ঢুকি। থালাভর্তি নাড়ু, মোয়া, তক্তি। বললাম, 'এখানে শুরু, শেষ কোথায় কে জানে?'

অনুরোধে, উপরোধে খাব না খাব না করেও শেষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলি। পরিশেষে চা। বিদায় নেওয়ার সময় সনির্বন্ধ অনুরোধ, রাতে আসবেন। অবশ্যই খিচুড়ি, লাবড়া ভোগ। হলদিবাড়ি থেকে তেলিপাড়া চা-বাগানে। সুবিস্তৃত মাঠে মেলা বসে গেছে। ভাজাভুজির দোকান। গ্যাস বেলুন উড়ছে। মনে পড়ে যাচ্ছিল কত বছর আগে বানারহাটের সুনীল চক্রবর্তীর সঙ্গে এই মাঠে পরিভ্রমণ করেছি। শুনেছি তাঁর নেতাজি প্রেমের কথা। কত গল্প করেছি এবং সেইসঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ। গাছের নীচে হাঁড়িয়া পানের আসর। পুজোগণ্ডার দিনে আকণ্ঠ পান। গাড়িতে বসেই ব্রজদার উপদেশ, জঠরকে একটু খালি রাখবেন গৌরীবাবু। সর্বত্র অল্পবিস্তর প্রসাদ নিতে হবে। তেলিপাড়া চা-বাগানে জমজমাট পুজোর আয়োজন, ধূপধুনো-গুগ্গুলের গন্ধ। ঢাকের বাদ্যি আর বাবুদের টানাহ্যাঁচড়া। নমো নমো করে দে ছুট। তেলিপাড়া থেকে বানারহাট চা-বাগান। চারপাশে চা-বাগান থাকলে যা হয়। বানারহাটে এখন জমকালো শহুরে ছাপ। তিরিশ বছর আগে প্রথম দেখার স্মৃতি ভেসে ওঠে। গত বছর বানারহাটের মধুবনে পার্থ-সুকন্যাদের আহ্বানে পুজোর কটা দিন কাটানোর কথা মনে পড়ল।

স্কুলমাঠে বিশাল মেলা, অন্যদিকে নাগরদোলা-সার্কাস। গাড়ি নিয়ে আমরা এথেলবাড়ির রামকৃষ্ণ মন্দিরে রানিমার স্নেহ-মমতা ভরা সান্নিধ্য লাভ করি। বারান্দায় পাতা পেতে খাওয়া। সন্ধ্যায় ডায়না নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের দৃশ্য। ফেরার পথে ডায়না সেতুতে দাঁড়িয়ে সামচি পাহাড়ের ঝিকিমিক আলোর রেখা দেখা। মিষ্টিমুখ করে মধুবনে ফেরা। দেবপাড়া হয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম রেডব্যাংক চা-বাগানে।

সে সময় রেডব্যাংক চা-বাগান বন্ধ। বড় দুঃসময়ের মধ্যে বাবু, শ্রমিকদের জীবন কাটছে। জরাজীর্ণ কোয়ার্টার, কঙ্কালসার চেহারা, চরম অনটনের মধ্যে দিন কাটছে। মালিকপক্ষ জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থাটুকু রেখেছেন এই যা। তবু বাগানে পৌঁছে দেখি বাবু-শ্রমিকদের হাসিমুখ। বাবুরা ব্রজদা বলতে অজ্ঞান। শ্রমিক-বাবুরা সমবেতভাবে আমার কাছে অভিযোগ করেন, কী হবে? শুধু দুঃখের পাঁচালি শোনা। আমি শ্রমিক নেতা, লেবার কমিশনার, 'ডাকসাইটে' মন্ত্রী নই। ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ। পেশা মাস্টারি। তা হোক, রেডব্যাংকের পুজো নিয়ে একটা ভ্রমণকাহিনি তো লিখবেন। দেখে তো গেলেন আমরা কেমন করে বেঁচে আছি। নেতাদের আশ্বাসবাণী শুনতে শুনতে কান পচে গেল। হয়তো কিছুদিন পর শুনবেন অনাহার, অর্ধাহারে মৃত্যুর সংবাদ। তাহলে পুজো করতে গেলেন কেন? মন মানে না। চাঁদা তুলে, আশপাশের চা-বাগানের সাহায্য নিয়ে করা হয়েছে। ছেলেপুলেদের গায়ে নতুন জামাকাপড় উঠল না। ওদের সকাতর প্রশ্ন, বাবা আমাদের বাগানে দুর্গাপুজো হবে না? এবার বোমা-পটকা ফাটাব না? দুটো সন্দেশ, ফলমূল, প্রসাদ নিয়ে গাড়িতে বসি। চা-বাগানের পথ ধরে আমরা পলাশবাড়ির নিউ ডুয়ার্স চা-বাগানের পুজো দেখে আসি চামুর্চি মোড় বানারহাট চা-বাগানের কালীবাড়িতে। এবার গয়েরকাটা যাওয়ার পালা। যাওয়ার পথে দুদণ্ড বসি বিন্নাগুড়ি চা-বাগানের এক বাবুমশাইয়ের কোয়ার্টারে। চা-কর্মী হলেও বসার ঘরে অজস্র কাটুম-কুটুমের সম্ভার। পুজোমণ্ডপে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে। সন্ধ্যালগ্নে ফিরে আসি গয়েরকাটা। যাওয়া হল না মধুবনী, খুন্টিমারির অরণ্য সফরে।

চান করে ব্রজদার কোয়ার্টারের সম্মুখের বারান্দায় বসি। অদূরে পুজোমণ্ডপে ভিড়। লক্ষ করে দেখবেন, প্রায় সব চা-বাগানেই স্থায়ী পুজোমণ্ডপ, মন্দির, কোথাও বা প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে। ব্রজদা জিজ্ঞেস করেন, ক্লান্ত হননি তো? নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল বলে উনি শুরু করেন অতীতের স্মৃতিচারণ। আমি চক্ষু মুদে শুনি। মাঝে মাঝে বউদি, না হলে কন্যারা চা দিয়ে যাচ্ছে।

বীরপাড়ার কাছে তাসাটি চা-বাগানে দুর্গাপুজোর সময় বাগান কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করেন। দেখাদেখি নাংডালাতে দুর্গাপুজো শুরু হল বাবু-শ্রমিকদের সহায়তায়। আদিবাসী ও নেপালিরাও পুজোর জন্য উৎসাহ বোধ করে। এসব স্মৃতি বোধহয় চল্লিশের দশকের। গয়েরকাটার কথাতেই বলি— সন্ধে হলেই বাঘের ডাক, কেরোসিনের টিমটিমে আলো। এসবের মধ্যেই গয়েরকাটা বাগানের কিছু গণ্যমান্য বাবুদের প্রচেষ্টায় সাড়ম্বরে পুজো শুরু হয়।

আচ্ছা ব্রজদা, ডুয়ার্সের চা-বাগানে কোন্ পুজোটা প্রাচীন বলতে পারেন? এ এক কঠিন প্রশ্ন। গবেষণার বিষয়। কোনও দিন ভাবিনি বা আমার মাথায় ঢোকেনি। তবে জেনেছি এবং দেখেছি, সাঁতালির জ্ঞান মণ্ডলের বাড়িতে, রাজাভাতখাওয়া স্টেশন চত্বরে, গোপালপুর চা-বাগানে;কিন্তু দুর্গাপুজো নিয়ে বেশিরভাগ হইচই মাতামাতি হত বলা যায় ডিমা চা-বাগানে। লালমুখো সাহেব, মেমরা দুর্গাকে কী চোখে দেখতেন জানি না, তবে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। ব্রজদার ভাষায়, চা-বাগানের সকল কর্মচারী সপরিবারে এক অনাবিল অনুভূতি, অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত আনন্দের জোয়ারে ভেসে যেতেন। বঙ্গ সংস্কৃতির ঢেউ আছড়ে পড়ত নির্জন চা-বাগানের সন্নিকটে, কালচিনির আশপাশের দুর্গাপুজোয়। এ ব্যাপারে স্মরজিৎ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগ স্মরণীয়। দলগাঁও অর্থাৎ বীরপাড়ার চিত্রটি যদি বর্ণনা করি তো চমকে উঠবেন। কী দেখেছি আর কী বিপুল পরিবর্তনের ঢেউ। দলগাঁও স্টেশনের গা ছমছম করা জঙ্গল। প্রায় জনমানবহীন। খানকতক টিনের ঘর। সন্ধে হলেই বাঘের আনাগোনা। আট ফুট চওড়া রাস্তা চলে গেছে লংকাপাড়া চা-বাগানের দিকে। সেই সময় একমাত্র গোপালপুর চা-বাগানেই দুর্গাপুজো হত। ব্রজদার হিসেবে ১৯৩৬ সালে মুরারীবাবু, পাঁচুবাবু, শ্যামাপদবাবুরা দুর্গাপুজোর জন্য জোরকদমে উঠেপড়ে লাগেন। বীরপাড়া চা-বাগানের কর্মচারী, মালিক সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথম বছরে পুজোয় খরচ হয়েছিল মাত্র পঁচাত্তর টাকা। ডুয়ার্সের পশ্চিম থেকে পূর্বে যত চা-বাগান, জনপদ রয়েছে তার পুজোর চালচিত্র ব্রজদার মস্তিষ্কে জমা আছে। মুশকিল হল তাঁকে দিয়ে সবিস্তারে লেখানো। গয়েরকাটা চা-বাগান থেকে অবসর নিলেও বানারহাটের কাছে মোগলকাটা চা-বাগানের গুরুদায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি পাগল এমন মানুষ বিরল। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি নিয়ে কত অকথিত কাহিনি ব্রজদার কাছে শুনেছি। চা-বাগান, উত্তরবঙ্গের মাটি, মানুষ, লতাপাতা ব্রজদার স্মৃতিভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

জঙ্গলের রূপকথা হলং বনবাংলো

উত্তরবঙ্গের গাঢ় নীল আকাশের নীচে পাহাড় আর পাহাড়ের পাদদেশে ঘন সবুজের রাজ্য— সুন্দরী ডুয়ার্স। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, ঘন জঙ্গল আর চা বাগানের সবুজ গালচে— প্রকৃতির সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে ডুয়ার্সের হাতছানি। ডুয়ার্সের নির্জন অরণ্যে আছে একশৃঙ্গ গণ্ডার, বুনো হাতি, গাউর, লেপার্ড, বুনো শুয়োর, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ সহ নানা বন্যপ্রাণী। শাল, সেগুন, লালি, চিকরাশি, টুন, গামার গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়ায় ময়না, বুলবুলি, দোয়েল, ভীমরাজ, কাঠঠোকরা— এইসব নানা প্রজাতির পাখি। জঙ্গলে রঙ ছড়ায় রঙিন বুনোফুল আর বর্ণময় প্রজাপতিরা।

ডুয়ার্সে আছে অসংখ্য নদী— তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি, সঙ্কোশ — যাদের কাচের মতো স্বচ্ছ জলে দেখা যায় নীল আকাশ আর সবুজ বনানীর জলছবি। এই সবুজ প্রকৃতির মাঝে থাকে টোটো, রাভা, মেচ, ডুকপা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ। তাই ভেবেছিলাম সব মিলিয়ে ভালোই লাগবে অরণ্যছাওয়া পথে কয়েকদিন ঘুরে আসতে।

ডুয়ার্সের জলদাপাড়া অভয়ারণ্য পর্যটকদের কাছে অতি পরিচিত নাম। এই অভয়ারণ্যের প্রবেশপথ মাদারিহাট। জলদাপাড়া বিখ্যাত তার একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য। এই জঙ্গলের স্বপ্নময়, প্রাণোচ্ছল সবুজের মাঝে রয়েছে হলং বনবাংলো। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মূল প্রবেশদ্বার থেকে ৮ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থান হলং বনবাংলোর। জঙ্গলে থাকার জায়গা হিসাবে এ বাংলো অতুলনীয়। তবে কোনও এক অজানা কারণে এখানে ঘরের বুকিং পাওয়া মুশকিল।

৭ জুন ২০০৯, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম মা আর আমি। রাত কেটে ভোর হল ট্রেনেই। পথে নিউ জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে তিস্তা নদীর ওপর সেবক ব্রিজ পার হতেই শুরু হল দুপাশে সবুজ চা বাগান, আবার কখনও ঘন জঙ্গল। আকাশে মেঘ-রোদের লুকোচুরি খেলা আর টিপটিপ বৃষ্টি দেখতে দেখতে সকাল এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম হাসিমারা। পৌঁছে শুনি সেদিন (৮ জুন) বার ঘণ্টার জন্য হাসিমারা বন্ধ। অনেক কষ্টে হলং বাংলো পর্যন্ত যাওয়ার গাড়ি যদিও বা জোগাড় হল, পথে দেখা গেল রাস্তার মোড় অবরোধ করে রেখেছে বনধ সমর্থকরা। গাড়ির ড্রাইভার ও স্থানীয় পুলিশের মধ্যস্থতায় অনেক কষ্টে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। পথে কিছুটা এগতে দ্বিতীয়বার পথ আটকাল আরও কিছু বন্ধ সমর্থক। দাবি, এ পথে যেতে হলে পূর্ববর্তী মোড় থেকে নেতাদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতিপত্র এনে দেখাতে হবে। কথা কাটাকাটি শুরু হল। অনেক অশান্তি করে অবশেষে গাড়ি ছাড়ানো গেল। সব মিটতে মিটতে বেলা দেড়টা বেজে যাওয়ায় মাদারিহাটেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। এরপর হলং-এর উদ্দেশে পা বাড়ানো। কলকাতা থেকেই বুকিং করা ছিল বনবাংলো।

অভয়ারণ্যের প্রবেশপথে বাংলোর বুকিং টিকিট দেখিয়ে জঙ্গলে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। দুপাশে জঙ্গল, মাঝখানের পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। কিছুদূর গিয়ে হলং নদী পেরিয়ে সামনেই বনবাংলো। বাংলোর সামনে একটা ছোট ঝোরা আর সল্টলিক। এই সল্টলিকেই নাকি আসে বন্যজন্তুর দল। থাকার জন্য বরাদ্দ হল নীচের তলার সল্টলিকমুখী ঘরটা। একটু বিশ্রাম নিয়েই এবার জঙ্গলে জিপ সাফারির তাড়া বিকেল তিনটের সময়। হুডখোলা জিপে রোমাঞ্চকর বনভ্রমণ। রাস্তা দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলল গাড়ি। বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি, যদি কিছু দেখা যায়। দু' ঘণ্টার সফরে যাওয়া-আসার পথে গণ্ডার, হরিণের সঙ্গে সঙ্গে ফিঙে, নীলকণ্ঠ, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগল— এইসব পাখির দেখা মিলল। জঙ্গলও দেখা গেল দুচোখ ভরে। ফেরার পথে হরিণডাঙা ওয়াচটাওয়ার থেকে দেখা অস্তগামী সূর্যের আলোয় জঙ্গল প্রকৃতির মনকাড়া সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ফিরে এলাম রাতের আশ্রয় হলং বনবাংলোতে।

রাত তখন আটটা-সাড়ে আটটা। বনকর্মীদের ডাকে দৌড়ে গেলাম সল্টলিকের দিকে। স্পটলাইটের আলোয় দেখা গেল, সেখানে তিনটে গণ্ডার আর কয়েকটা সম্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ চোখে আলো পড়ায় কিছুটা যেন হতভম্ব। কিছুক্ষণ পর আলো নিভিয়ে দেওয়া হলেও ওখান থেকে উঠে আসতে মন চাইল না। আগের দিনই পূর্ণিমা থাকায় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল জঙ্গল জুড়ে। সামনে কুল কুল শব্দে বয়ে চলা ছোট্ট ঝোরাটা চাঁদের আলোয় যেন রূপোলি ফিতে। বড় বড় গাছের নীচে জমাট অন্ধকার। রাস্তায় আলো-ছায়ার বুটিকাটা। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে শোনা যাচ্ছে তক্ষকের ডাক। আমাদের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে লেপার্ড, গণ্ডার, হাতি— এ কথা ভেবেই শরীরে রোমাঞ্চের শিরশিরে অনুভূতি। ডুয়ার্সের জঙ্গলের রাতও মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করে পর্যটককে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল নাম না-জানা হরেক পাখির ডাকে। গতকাল রাতেই কথা বলা ছিল, যে কদিন থাকব প্রতিদিন সকালে হাতি সাফারি চাই। চটপট তৈরি হয়ে বাংলোর সামনে রাইডিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম হাতির পিঠে চড়ে বনভ্রমণের অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে। প্রথম হাতিটাতেই চড়লাম, নাম লক্ষ্মী। হেলেদুলে হাতি চলল জঙ্গলের পথে মাঝে মাঝে ঘাস ছিঁড়ে খেতে খেতে। পাখির ডাকে ভরে আছে জঙ্গল। সামনে ছোট একটা জলা। সেখানে বসে কাদা মাখছে একটা গণ্ডার। এত কাছ থেকে বুনো গণ্ডার দেখে উত্তেজিত আমরা ছবি তোলার জন্য এগিয়ে পেছিয়ে নানাভাবে হাতি দাঁড় করিয়ে ক্যামেরার সাটার টিপতে থাকি। ভদ্র-সভ্য গণ্ডারও ছবি তোলার প্রচুর সুযোগ দেয়। অবশেষে অন্য হাতির লোকজনের চেঁচামেচিতে সরে যেতে হল, কারণ তারাও তো দেখবে! হাতিতে চড়ে ছোট নদী পার হয়ে পৌঁছাই বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের বনে। বর্ষার জলে তরতাজা এলিফ্যান্ট ঘাসের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দেখি, সামনে একপাল চিতল হরিণ। ভালো করে দেখার সময়টুকুও না দিয়ে তারা মিলিয়ে গেল আরও ঘন ঘাসের জঙ্গলে। ঘাসবন থেকে বেরিয়ে নদী পার হওয়ার সময় নদীর জলে আধা-ডুবন্ত আরেক গণ্ডারের দেখা মিলল। কাছেই ঘন জঙ্গলে দেখা গেল একটি গাউর। হাতি এগতেই সে আশ্রয় নিল ঘন ঝোপের মধ্যে, কেবলমাত্র মুখটা বার করে রাখল আমাদের ওপর নজর রাখতে। তাকে আর বিরক্ত না করে ফেরার পথ ধরলাম। সল্টলিকের পাশ দিয়ে ফেরার সময় দেখি, পটভূমিতে নীল আকাশ আর সবুজের সমারোহে ঝলমল করছে হলং বনবাংলো।

ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম খয়েরবাড়ি লেপার্ড রিহ্যাবিলেটেশন সেন্টার ও নেচার পার্কের উদ্দেশে। শাল, সেগুনের নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। দিনের বেলাতেও একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বুড়ি তোর্সা নদী। জঙ্গলের এই পথে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। হলং থেকে খয়েরবাড়ির দূরত্ব ১০-১১ কিলোমিটার। এখানে ব্যাটারিচালিত গাড়িতে লেপার্ডের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো যায়। সাফারি পার্কের মুক্ত পরিবেশে লেপার্ডের আনাগোনা দেখা অবশ্যই ভিন্নস্বাদের। সার্কাস থেকে মুক্তি পাওয়া বাঘেদেরও এখানে টাইগার রেসকিউ সেন্টারে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। লেপার্ড সাফারি পার্কের গা ঘেঁসে বুড়ি তোর্সার পাশে দারুণ এক ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ার থেকে চারপাশের সবুজের সমারোহ আর স্বচ্ছ টলটলে জলে ভরা বুড়ি তোর্সাকে দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। নদীর ওপর সুন্দর কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে নেচার পার্কে ঢুকতে হয়। জঙ্গলের মাঝে মনভোলানো পরিবেশে বোটিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। ফেরার পথে চোখে পড়ল বড় গাছের গায়ে ফুটে আছে সাদা রঙের অর্কিডের ফুল। এবার চলা টোটোপাড়ার পথে। স্থানীয় জনজাতি টোটোদের বাস পাহাড়, নদী, জঙ্গলে ঘেরা

টোটোপাড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেখা হল না টোটোপাড়া। আবার কয়েক কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে ডাকা হয়েছে বন্‌ধ। রাজনীতির দাদাদের চোখরাঙানি আর গাড়ি ভাঙচুরের প্রচেষ্টার মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে আসি। অসহ্য রোদ, গরমে আর বন্‌ধ সমর্থকদের হুমকিতে অসুস্থ মাকে নিয়ে কোনওক্রমে বেরিয়ে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় সাইকেল ভ্যান ভাড়া করে ফিরি অভয়ারণ্যের গেটে। পেছনে পড়ে রইল গাড়ি।

দিনের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার ফলে দুপুরের খাওয়ার পর আর জিপ সাফারিতে বেরতে ইচ্ছা করল না। দুপুরের রোদে সবাই বাংলোর ভেতরে, বাইরেটা শুনশান। মাও বিশ্রাম করছে। কিন্তু আমার ঘরে বসে থাকতে মন চাইছিল না বলে বাংলোর সামনে বাঁধানো ঘাটের পাশে ক্যামেরা নিয়ে বসে পড়লাম। দলে দলে সবুজ পায়রা (কমন গ্রিন পিজিয়ন) এসে সামনের সল্টলিকে বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। সামনে সল্টলিকের মাঠে বনকর্মীরা প্রচুর নুন ফেলে রেখেছে। এই ফাঁকা জায়গাটা পেরলেই শুধু সবুজ আর সবুজ। দুপুরের সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত জঙ্গল। সারাদিন ঘোরঘুরি ক্লান্তিতে আর রঙিন প্রজাপতির ওড়া দেখতে দেখতে কখন যেন দুচোখের পাতা বুজে এসেছিল। হঠাৎ চমক ভাঙল অদ্ভুত ঘড় ঘড় শব্দে। অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন শব্দের উৎসটা বুঝতে চাইছি তখন দেখি, জঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা মা হাতি, সঙ্গে দুটো বাচ্চা। মা হাতি এগিয়ে এল সল্টলিকের মাঠে নুন খেতে। মা আর বড় বাচ্চাটা নুন খেতে লাগল আর ছোট বাচ্চাটা মায়ের দুধ। অসাধারণ দৃশ্য! মন ভরে ছবি তুললাম। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়াতে ছুটে গিয়ে জানলার নীচ থেকে ডেকে বললাম দূরবীণ দিয়ে দেখতে। আমার ডাকাডাকিতে বাংলোর অন্যান্য ঘর থেকে আরও দর্শক এসে হাজির হল হাতি দেখতে। নানা অঙ্গভঙ্গি করে হাতিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাচ্চা হাতিগুলো শুঁড় দিয়ে ধুলো তুলে এ ওর দিকে ছুঁড়ছিল। কখনো বা একজন অন্যজনের লেজ ধরে টানছিল। সবচেয়ে ভালো লাগছিল যখন কোনও বাচ্চা কিছুটা দূরে চলে যাচ্ছিল, মা তখন শুঁড় দিয়ে কাছে টেনে আনছিল। ঠিক মানুষের মায়ের মতো আগলে রাখছিল বাচ্চাকে। প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে মা হাতি বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল।

এরপরই একপাল বাঁদর নামল মাঠে,

সবার সেরা গরুমারার সেরা ঠিকানা

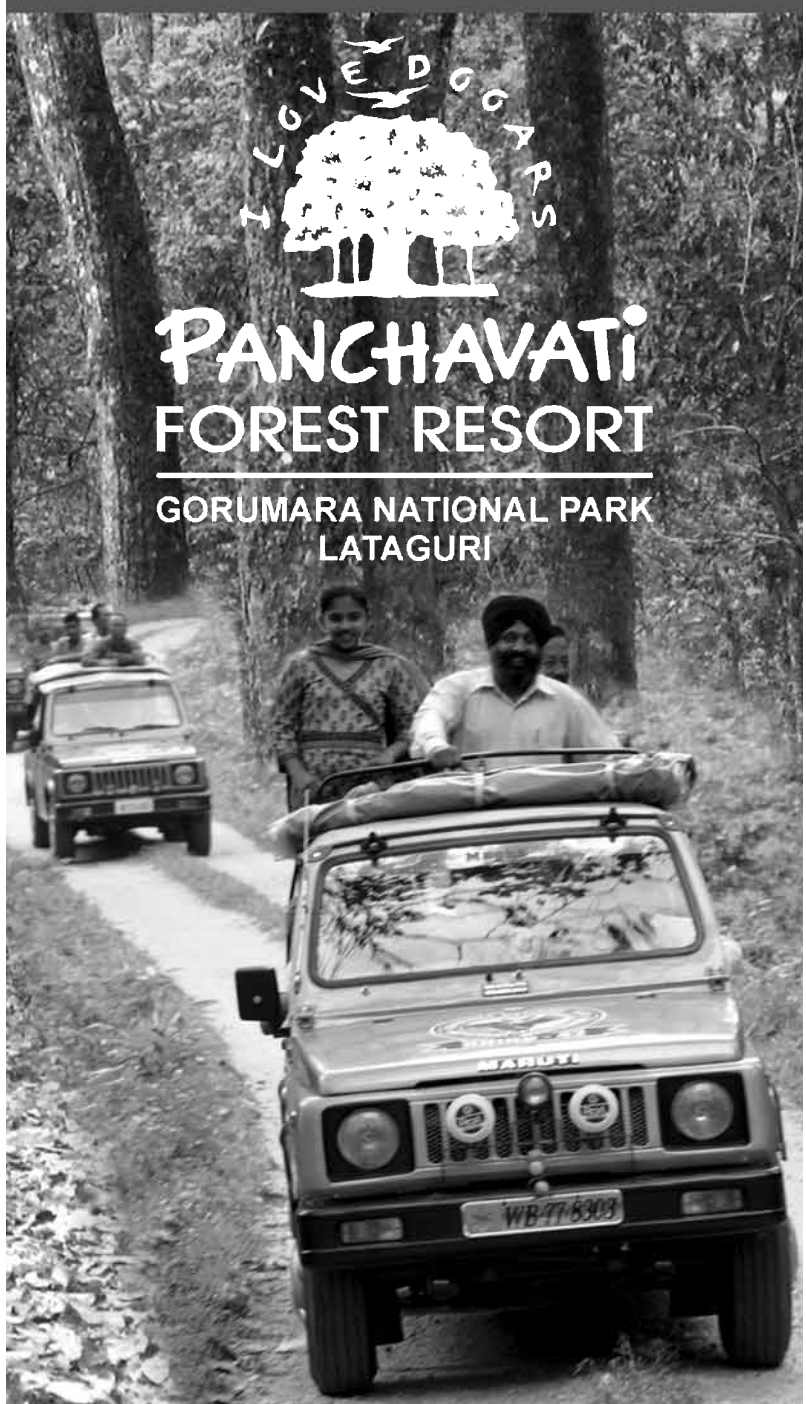

Gorumara National Park, Post: Lataguri, District: Jalpaiguri 735101, India
Phone : 03561-266284 (Resort) Phone : 0353-2662254 (City Office, Siliguri, WB)
Cell : 98320-68303 / 98320-60164 / 94743-83828
E-mail: panchavatiforestresort@gmail.com / info@panchavatiforestresort.com
Website: www. panchavatiforestresort.com

নুনের ঢিপিতে নুন খেতে। বড়রা যখন খেতে ব্যস্ত ছোট বাচ্চাগুলো তখন মায়েদের গায়ে লেপ্টে ছিল আর একটু বড় বাচ্চাগুলো নিজেদের মতো খেলা করছিল। বাঁদরের দলের আশপাশে এসে যোগ দিল দুটো ময়ূর। ছবি তোলার মাঝে হঠাৎ দেখলাম বাঁদরের দলের দ্রুত পলায়ন। ময়ূর দুটোও সরে গেল জলের ধারে। কারণটা বুঝতে অবশ্য দেরি হল না। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আছে একটা গাউর। মানুষজন বোধহয় তার খুবই অপছন্দ। তাই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আমাদের তাড়াতে ব্যর্থ হয়ে বোধহয় কিছুটা বিরক্ত হয়েই আবার জঙ্গলে ফিরে গেল। যদিও ততক্ষণে তার অসাধারণ ভঙ্গিমার ছবি তুলে নিতে ভুল হয়নি। এরপর পিছনের জঙ্গল থেকে এসে হাজির দুটো গণ্ডার। ময়ূর আর পায়রার দলও আবার ফিরে এসেছে। সামনের মাঠে তখন পশু আর পাখির একত্র সমাবেশ। এসব দেখতে দেখতে খেয়ালই হয়নি কখন আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। দু'-এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়তেই ক্যামেরা বাঁচাতে ছুট দিলাম বাংলোর দিকে। ঘরে এসে দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গণ্ডারগুলো দিনের মিলিয়ে যাওয়া আলোয় আস্তে আস্তে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে টিপটিপ বৃষ্টি আর জলে ভেজা জঙ্গলের সোঁদা গন্ধ মনকে উদাস করে তোলে। বৃষ্টির সন্ধ্যায় আর কিছু করার না থাকায় রান্নাঘরে পিঁয়াজির অর্ডার দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে করতে সারাদিনে তোলা ছবিগুলো দেখছিলাম। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম তক্ষকের ডাক শুনে। কাছ থেকে শুনলে যে তক্ষকের ডাক এতটা ভুতুড়ে লাগে তা ভাবতেও পারিনি। খুঁজে দেখলাম তক্ষক বাবাজির বাসা আমাদের টয়লেটের কাঠের দেওয়ালের গর্তে, আর ওখানেই সে পোকা ধরছে। এভাবে এত সামনাসামনি তক্ষক দেখতে পাব কখনও ভাবিনি। বৃষ্টির জন্য সেদিন ঘরের আলোতে আলোতে রকমারি পোকার সমাবেশ। এত রঙ-বেরঙের পোকা আগে কখনো দেখিনি। তবে পোকার উপদ্রবে সেদিনের রাতটা মশারি খাটিয়ে শুতে হল। রাতে বৃষ্টির টুপটাপ আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলেও বার বার ঘুম ভেঙে গেছে তক্ষকের ডাকে।

১০ জুন বৃষ্টিধোয়া জঙ্গলের ঠান্ডা হাওয়ার শিরশিরে অনুভূতিতে যখন সকাল হল তখনো আকাশের মুখ ভার। রাইডিং পয়েন্টে পৌঁছে যে হাতির পিঠে চড়ে শুরু হল এদিনের বনভ্রমণ, তার নাম পূর্ণিমা। আজও দেখা গেল একাধিক গণ্ডার। তারপর মেঘ কেটে রোদ উঠতেই ঘাসের বনে হরিণের দলও চোখে পড়ল। তারা আমাদের দেখে পালিয়ে না গেলেও দূরে সরে যায় বার বার। ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগল আর মাছরাঙাও বেশকিছু দেখা গেল। রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় অনেক প্রজাপতিরও দেখা মিলল। তারা জলে ভিজে সূর্যের আলোয় ডানা মেলে বসেছিল যে! বৃষ্টিভেজা জঙ্গল, গাছ থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটা, সূর্যের রোদে ঝলমলিয়ে ওঠা মাকড়সার জালের সৌন্দর্য— তাই বা কম পাওনা কিসের! রাইডিং পয়েন্টে ফিরে এসে হাতিকে কলা খাওয়ানো আর তার সঙ্গে ছবি তোলার অভিজ্ঞতাও বেশ মজার।

আজও ব্রেকফাস্টের পর বাংলোর সামনের রাস্তায় ঘুরতে বের হলাম। হলং

নদী পেরিয়ে এগতেই দেখি— সামনের গাছে একদল ময়না। তাদের সুরেলা ডাকে বনের পরিবেশ ভরে উঠেছে। পথের ধারে ধারে দেখা গেল নাম না-জানা উজ্জ্বল রঙের সব বুনোফুল। আরও এগতে পথের বাঁকে কিছুদূরে দেখা গেল গাছের গুঁড়িতে খেলায় ব্যস্ত উজ্জ্বল খয়েরি রঙের দুটো দৈত্যাকার কাঠবিড়ালি (ইন্ডিয়ান জায়েন্ট স্কুইরল)। একটু এগতেই বোধহয় আমাকে বা মাকে দেখে ফেলেছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে গাছের মগডালে উঠে পাতার আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল। বাংলোয় ফেরার রাস্তায় মরা গাছের ডালে চোখে পড়ল ব্যস্ত কাঠঠোকরা (ইন্ডিয়ান গোল্ডেন উডপিকার)। ফিরে এসে লাঞ্চের আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম ঘরে বসে। খাওয়া মিটলে আবার গিয়ে বসি সল্টলিকের সামনে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একটা মাকনা হাতি বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। খানিকটা ঘোরাঘুরি করে ও কিছুটা নুন খেয়ে একসময় ফিরেও গেল। তারপর মাঠে নামল বাঁদর আর পায়রার দল, সঙ্গে একটা ময়ূর। তারা চলে যাওয়ার পর সারা দুপুর, এমনকী বিকেলে বসে থেকেও কারও দেখা পাওয়া গেল না। উঠে এসে বাংলোর সামনে প্রজাপতি, রোদ পোয়ানো গিরগিটি এসব দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম। শেষ বিকেলে বাংলোয় ফেরার আগে আরেকবার মাঠের সামনে গিয়ে বসার উদ্যোগ করতেই বুঝলাম, আজকের দিনে জীবজন্তুদের বন্ধ ডাকার কারণটা কী! একটা লেপার্ড চোখের

নিমেষে সামনের ঝোরাটা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। একঝলক দেখা গেল মাত্র। অন্ধকার নেমে আসতে বাংলোয় ফিরে এলাম। আজ হলং বাংলোয় শেষ রাত। এরপর কদিনের সব রোমাঞ্চকর ঘটনাকে পেছনে রেখে ফিরতে হবে কলকাতার কংক্রিটের জঙ্গলে। তবে সঙ্গে নিয়ে যাব মোহময়ী জঙ্গলের মন কেমন করা স্মৃতি। অন্ধকারে ঘরের সামনে গাছের পাতা দুলছে অল্প অল্প হাওয়ায়। তার ফাঁক দিয়ে নরম চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতরে। ঘরের আলো নিভিয়ে জানলায় বসে উপভোগ করছি জঙ্গল-প্রকৃতির মহিমা আর ভাবছি কাল এ সময়ে এদের ছেড়ে চলে যাব কত দূরে।

পরদিন ১১ জুন সকালে ঘুম ভাঙল ঘরের সামনের গাছে বসা বুলবুলি পাখির ডাকে। রাইডিং পয়েন্টে আজও পূর্ণিমা নামের হাতিটার পিঠে সওয়ারি আমরা। অভিজ্ঞ মাহুত আজ অন্য রাস্তা দিয়ে হাতি নিয়ে চলল। ঝোপের আড়ালে বিশ্রামরত সম্বর দেখা গেলেও আমাদের দেখেই সে দৌড় লাগাল। আমাদের সহযাত্রীর অনুরোধে হাতি এগল তার পেছনে পেছনে। আড়াল খুঁজতে সে এলিফ্যান্ট ঘাসের বনে ঢুকে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেখানে পৌঁছলাম। সম্বর ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেলেও সামনে হঠাৎ দেখা গেল রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে একটা গণ্ডার। তার যুদ্ধংদেহি ভাবভঙ্গি দেখে হাতি পিছিয়ে নেওয়া হল। ঘাসবন ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে গাছের ডালে খেলা করতে দেখা গেল দুটো দৈত্যাকার কাঠবিড়ালিকে। হাতির পিঠে আমাদের দেখে নিমেষে উধাও। ভরা মন নিয়ে ফিরে চললাম। ফেরার পথে ঘন ঝোপের অন্ধকারে বসে থাকতে দেখা গেল একটা শিঙাল সম্বরকে। বাংলোর কাছেই গাছের ওপর একটা মদনটাক (লেসার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক) বসেছিল। আজ জঙ্গল থেকে ফিরতে মন চাইছিল না, তবু ফিরতে হল। আজ যে বাড়ি ফেরার দিন।

বাংলোয় ফিরে ব্যাগ গুছিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। বেলা এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে হলং বনবাংলোকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ফালাকাটার উদ্দেশে। প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। ফালাকাটা থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস ধরব হাওড়ায় ফিরতে। তিন দিনের জঙ্গলভ্রমণ শেষে সবুজের দেশ ছেড়ে এবার ঘরমুখো। কলকাতায় ফিরলাম ১২ জুন ২০০৯ সকালবেলায়।

বড় বড় গাছের সুগভীর জঙ্গল, দূরে নীল পাহাড়, তিরতির করে বয়ে চলা নদীর জল, দামাল বন্যপ্রাণী—এই নিয়েই এক স্বপ্নময় জগৎ ডুয়ার্স। সবুজ এখানে কথা বলে। এ সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ কেবলমাত্র মনে মনে অনুভব করার। হলং বনবাংলোর কদিনের এই স্মৃতি মনের কোণায় ধরে রেখে জঙ্গলের ডাকে বারে বারে ফিরে আসতে চাই ডুয়ার্সের স্বপ্নিল প্রকৃতির কোলে।

প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ হলং বাংলোয় থাকতে হলে অবশ্যই অগ্রিম বুকিং করুন। কলকাতা থেকে এই বনবাংলো বুকিং হয়, টুরিজম সেন্টার, ৩/২ বিবাদী বাগ (পূর্ব), কলকাতা ৭০০০০১ থেকে। জলদাপাড়া বন্ধ থাকে প্রতিবছর ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময়টা বাদ দিলে বাকি সারা বছরই যাওয়া যায় হলং বনবাংলোয়।

সোমা দত্ত

ডুয়ার্সের দুয়ার
ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি মানে ডুয়ার্সের দেউড়ি। কৃষিজ পণ্যের সমৃদ্ধ বাজার। আবার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির ধারক-বাহক। বহু উত্থান-পতনেরও সাক্ষী। অথচ সেই শহর এখনও কেন জানি উপেক্ষিত, অবহেলিত। চাইলে এই শহর থেকেই শুরু করা যেত ডুয়ার্স পরিক্রমার প্রথম কাহন।

বহুদিন আগে একটি ছড়া লিখেছিলাম; এখনো অনেকের মুখে মুখে ফেরে— 'ধূপের গন্ধ নাই বা থাকুক/ ধূপদানিটাও ফাঁকা/ ধূপগুড়িতে উড়ছে নাকি/ দুটি দেশের টাকা।/ আঁচল ভরা আলু-বাগান/ লাখের হিসেব চলে/ সবজিগুলো মহার্ঘ্য আজ/ বিকতো আগে জলে।/ হিমঘরে সব ব্যস্ত মানুষ/ বস্তাগুলো গোনে/ বামনি এবং জলঢাকা তাও/ চলছে আপনমনে।/ মাঝে মাঝে রাস্তা গরম/ লম্বা মিছিল হাঁটে/ মঙ্গলে ভুল হলেও যেয়ো/ শনিবারের হাটে।/ চা-বাগানের গন্ধ নিয়ে/ অনেক মানুষ আসে/ কংক্রিটে তার মুখ ঢেকেছে/ তাও সে ভালবাসে।/ রঙ-কবিতা-নাটক-গানে/ নেই যে কোন জুড়ি/ অতীতটাকে হাতড়ে বেড়ায়/ উদাসী ধূপগুড়ি।'

একসময় ধূপগুড়ি বাজারে এসে অবাক হয়ে যেতাম। এটা ভারতবর্ষ, না ভুটান! কী অনায়াসে ভুটানি নোটের লেনদেন চলছে। সকলের পার্সেই কিছু না কিছু ভুটান-নোট। এখন অবশ্য সে ছবি বদলে গেছে। ভুটানি নোট ভুটানে ফিরে গেলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ধূপগুড়ি এখনও জমজমাট।

অনেকে বলেন 'আলুর শহর'! শুনতে কানে খটকা লাগলেও কথাটা কিন্তু বহুলাংশে সত্যি। আলুচাষ ধূপগুড়ির অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। লাখপতি তো সেদিনের কথা ছিল, আলু-ব্যবসাকে হাতিয়ার করে এখন ধূপগুড়িতে কোটিপতির সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। আলুর ঋতুতে শহর জুড়ে রাজ্যের নানান প্রান্তের লরির মিছিল। পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী আলুবীজ নামিয়ে পাগড়ি ঠিক করে নিচ্ছেন। লরির কেবিনে বাজছে জোরদার ভাংরা গান। স্টেশনে রেলের রেকে বোঝাই হচ্ছে আলু। সেখানেও গাড়ির ভিড়। হিমঘরগুলোর সামনেও গাড়ির লাইন। দেখতে দেখতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে আলু বিপণনের দোকানপাট। সার ও কৃষিজ রাসায়নিক-কীটনাশকের দোকানের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। ধূপগুড়ির বহু মানুষ আলু-ব্যবসার সূত্রে দেশের নানান প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। অনেক গ্রামীণ মানুষ আলু-ব্যবসার সূত্রে প্রচুর উপার্জন করে ঝাঁ-চকচকে বাড়ি-গাড়ি করে ফেলেছেন। দেখতে দেখতে ধূপগুড়িতে বেশ কিছু ব্যাঙ্কের শাখা খুলে গেল। সবাই ভালো ব্যবসা করছে।

অথচ আগে এই ধূপগুড়ি ছিল ডুয়ার্সের এক সমৃদ্ধ হাট। চা-বাগানের গন্ধ মেশা। ডুয়ার্সের প্রকৃত দুয়ার তো ধূপগুড়িই। ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে কয়েক কিলোমিটার এগলেই সবুজ সাম্রাজ্যে প্রবেশ।

ধূপগুড়ি নিয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছেন শালবাড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবোধ কুমার সেন। ধূপগুড়ি নামের উৎস

বিশাল ময়াল সাপ কাঁধে সর্পবিশারদ মিন্টু চৌধুরী

সন্ধান করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ধূপগুড়ি নামের ব্যাপারে একাধিক মতামত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ধূপী গাছ, ধোপগাছ বা ধূপগাছের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং এলাকায় এই গাছের কাটা গুঁড়ি পড়ে থাকত বলে এই এলাকার নাম হয়েছে ধূপগুড়ি। কোনও কোনও অনুসন্ধানী গবেষক মনে করেন বর্তমানে নাথুয়া বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে বর্তমান গাদং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পর্যন্ত ছিল গহন ও গভীর শালগাছের অরণ্য, শালগাছের আঠা থেকে স্থানীয়ভাবে ধূপ তৈরি হয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিশেষ করে হিন্দুরা, গাছ-পাথর ইত্যাদিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতেন। শালগাছকে বনদেবতা বা বনদেবী হিসাবে পুজো করতেন। যেহেতু এই গাছের আঠা থেকে ধূপ তৈরি হত, তাই সম্ভবত নাম হয়েছিল ধূপঠাকুর। বিদগ্ধ কিছু গবেষক মনে করেন এখানে গুড়ি অর্থাৎ গঞ্জ। যেমন কামাক্ষ্যাগুড়ি এবং মহাকালগুড়ি। এখানে খুব সাধারণভাবেই বোঝা যায় কামাক্ষ্যাঠাকুর এবং মহাকালঠাকুরের নামে এই গঞ্জ দুটোর নাম হয়েছিল। শেষোক্ত এই অভিমত ধূপঠাকুর থেকে ধূপগুড়ি বেশি গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিনির্ভর মনে হয়।'

এখন অবশ্য ধূপগুড়িতে ঢুকতেই নাকে আসবে তীব্র পচা গন্ধ, শুঁটকিমাছের পট্টি পেরিয়ে যেই শহরঘেঁসা কুমলাই ব্রিজে পৌঁছানো যাবে অমনি নজরে পড়বে ভয়াবহ নদী দূষণ। শহরের আবর্জনা নিতে নিতে নদী মৃতপ্রায়। দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অদলবদল হলেও কুমলাইয়ের কষ্টের পরিবর্তন হয়নি। তবে কৃষির ওপর নির্ভর করেই ধূপগুড়ি বাড়বাড়ন্ত। শুধু আলুচাষ নয়, ধান-পাট তো ছিলই, শাকসবজি উৎপাদনেও ধূপগুড়ির মুন্সিয়ানা এখন স্বীকৃত। ১৯৯০-এর ৫ মে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ শিলান্যাস করেন ধূপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের। বিস্তৃত এলাকার কৃষকদের কাছে এ এক অসামান্য উপহার। ভোর থেকে এখন প্রতিদিন জমজমাট এই বিশাল বাজারটি। ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বানারহাট, মাল ও নাগরাকাটা— এই পাঁচটি থানা এলাকার কৃষকদের কথা ভেবে এই বাজারটি তৈরি হয়েছিল। সারা রাজ্যে যে কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম বৃহত্তম। ইতোমধ্যে রাজ্যসেরার স্বীকৃতিও পেয়েছে। এই বাজার থেকে দূরদূরান্তে কৃষিজ পণ্য যায়। প্রচুর মানুষের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। নিয়ম-বেনিয়মে সুপারির ব্যবসারও বাড়বাড়ন্ত। ধূপগুড়ি থানার পত্তন হয় ১৯০৫ সালের ১১ জুলাই। যদিও ২০০৫-এ তার শতবর্ষ প্রায় নীরবেই পেরিয়ে যায়। ধূপগুড়ি পুরসভার মর্যাদা পেয়েছে ২০০১ সালে।

সৃজনজগতে ধূপগুড়ি বার বার তার স্বাক্ষর রেখেছে। লাগোয়া গ্রামীণ এলাকায় লোকসংস্কৃতির বিপুল সম্ভার। ভাওয়াইয়া তো এখানকার প্রাণের সম্পদ, একদা গভীরভাবে চর্চা হত কুষাণযাত্রা, বিষহরা পালা, চোরচুন্নীর গান ইত্যাদি। ধূপগুড়ি ব্লকের গোঁসাইয়ের হাট অরণ্যের বনবস্তিতে থাকে রাভা জনগোষ্ঠী। তারা সযত্নে তাদের

সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। দীর্ঘদিন থেকে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গোনাথ রাভা। তাদের চিংড়িশিকারের নাচ, হান্ডাবারু নৃত্য রীতিমতো বিখ্যাত। একসময়ে নাট্যচর্চায় ধূপগুড়ি গুণীজনের সমীহ আদায় করে নিয়েছিল। যাত্রাপালা, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক একের পর এক প্রযোজনা করে চমকে দিয়েছিলেন সে সময়ের অভিনেতারা। খোকা রায়, অবনী গোস্বামী, ডাঃ নন্দী, সুভাষ চক্রবর্তী, ডাঃ হরিদাস গুপ্ত, সুরেশ দে, মাধব কর্মকার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকের নাম এখনও মনে রেখেছে ধূপগুড়ি। রবীন্দ্রায়ন ক্লাব এখন নেই, কিন্তু অনেকের স্মৃতিতেই রয়ে গেছে সেখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে শেক্সপিয়ার, বার্নাড শ মঞ্চস্থ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল ৫০/৬০-এর ধূপগুড়ি। সেই উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে গেছে পরবর্তী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তরুণ নাট্য সংস্থা, গণনাট্য সংস্থা, এস টি এস ক্লাব, এফ ইউ এস সি, আর্থ কালচারাল গ্রুপ, নবজীবন সংঘ ইত্যাদি। ব্যাঙ্কে কাজ করেও উৎপল চৌধুরী ধূপগুড়ির সাংস্কৃতিক (বিশেষত নাটক) চর্চার ঘরানাকে ধরে রেখেছেন। তিনি তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী দেবযানী চৌধুরীকে নিয়ে চালাচ্ছেন বাচিক শিল্পের প্রতিষ্ঠান 'সোনার তরী'। ভাওয়াইয়া গানের অনেক শিল্পী এখানে। অনলস কাজ করে যাচ্ছেন শিল্পীদম্পতি সিদ্ধেশ্বর রায় ও সুমিত্রা রায়। ধূপগুড়ির কালীরহাটের লোকশিল্পী নরেন রায়ের হাতে তৈরি দোতারা সারা রাজ্যের লোকশিল্পীদের হাতে হাতে ঘোরে। এই কৃতী কারিগর যোগ্য সম্মান পাননি। সারি-জারি গানে ক্ষীরোদ সরকার স্বনামধন্য। ধূপগুড়িতেই থাকেন বাংলার সর্বশেষ দরবেশ কালাচাঁদ দরবেশ, দেশবিদেশে যিনি অনুষ্ঠান করে নজর কেড়েছেন। এখন প্রবল অসুস্থতায় অসহায়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। রেলের কামরায় গান করে যিনি মাধুকরী জোগাড় করতেন, তিনিই আবার ইওরোপ মাতিয়ে দিয়ে আসেন দরবেশী গানে।

ধূপগুড়ির অনিল অধিকারী লোকনাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। গ্রামেগঞ্জে তাঁর রচিত পরিচালিত নাটক তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। ধূপগুড়ির ম্যাডোনা ডিস সেন্টার প্রতি বছর ভোরে লোকাল চ্যানেলে দেখাত নিজেদের তৈরি বিশেষ শারদ অনুষ্ঠান (অমিত কুমার দে-র কথায় ও সুরে)। 'বাজলো তোমার আলোর বেণু', 'দশ দিকে দশরূপা', চিন্ময়ী রূপে আয় মা ধরায়', 'গৌরী এলো ঘরে', 'দশভূজা আসে ঐ' অনুষ্ঠানগুলি ধূপগুড়ির সংস্কৃতির সম্পদ। এখানকার শিল্পীরা যে উৎকর্ষে এই মৌলিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছেন ভাবা যায় না। এগুলির যথাযোগ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

ধূপগুড়ি কমিউনিটি হল

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট

সাহিত্যে ধূপগুড়ি সম্ভ্রম আদায় করেছে বড় ক্যানভাসে। একসময় বিখ্যাত কবি তুষার বন্দোপাধ্যায় ধূপগুড়ি হাইস্কুলে সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সাহিত্য পরিমণ্ডল। বাংলাভাষার অত্যন্ত শক্তিশালী কবি অন্যমন দাশগুপ্ত অকালে চলে গেছেন, কিন্তু সারস্বত সাধনায় এখনও উজ্জ্বল পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অমিত কুমার দে, চিত্রভানু সরকার, অনুভব সরকার প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাকার জীবন সরকারও তো ধূপগুড়িরই মানুষ, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে ধূপগুড়ির কথা ফিরে ফিরে আসে। নিখিল বসুর অসাধারণ সম্পাদনায় ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'লাল নক্ষত্র' পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি ছিল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অহংকার। নিখিলদা কী ভালো গদ্য লিখতেন, তাঁর পড়াশোনার কত ব্যাপ্তি, অথচ এখন স্বেচ্ছা-অবসরে লেখালেখি থেকে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিয়েছেন। তপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লাল নক্ষত্র' একসময় ঝড় তুলেছিল এই এলাকায়। সেই ঐতিহ্যের পথ ধরে এখন প্রকাশ পায় ডঃ কৃষ্ণ দেব-এর সম্পাদনায় সংবাদ পাক্ষিক 'প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা'। ধূপগুড়ি

থেকেই প্রকাশ পায় গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'চিকরাশি', উত্তরবঙ্গের লেখকদের ধরে ধরে এরকম বিস্তারিত কাজ আগে কখনও হয়নি। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

ধূপগুড়ির আর এক অহংকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্পবিদ মিন্টু চৌধুরী। সাপুড়ে পরিবারের কেউ না হয়েও সাপেদের নিয়েই কাটিয়ে দিলেন গোটা জীবন। উত্তরবঙ্গের বনে তাঁর হাত ধরেই হয় প্রথম সর্পসমীক্ষা। প্রাণ দিয়ে তিনি আগলে রাখেন নানান প্রজাতির সাপ। অসুস্থ বা আহত সাপের কথা শুনলেই ছুটে যান। সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তাদের ভালো করে আবার প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেন। নিজে আবিষ্কার করেছেন একগুচ্ছ নতুন প্রজাতির সাপ, যা আগে আন্তর্জাতিক স্নেক ডিকশনারিতে ছিলই না। ২০০৪-এ বনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্প-সমীক্ষাপত্র 'গাইড টু স্নেক্স অব গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক'। ২০০১ সালে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসেন বিশ্ববিখ্যাত সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস্ সাফারি পার্কের সরীসৃপ সংগ্রহশালার কিউরেটর মার্ক ও'শিয়া। মিন্টুবাবুর কাজের বহর দেখে তিনি চমৎকৃত হন। তাঁকে মিন্টুবাবু অনায়াসে ধরে দেখান গরুমারার অতিকায় ইন্ডিয়ান রক পাইথন। ডিসকভারির অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে 'বিগ অ্যাডভেঞ্চার সিরিজে' মিন্টুবাবুর এই পাইথন অভিযান 'বিগ পাইথন হান্ট' শিরোনামে দেখানো হয়। তিনি যে অসমসাহসে অবলীলায় কালাচের মতো বিষাক্ত সাপ ধরে ফেলেন তা দেখে ভিনদেশী বিশেষজ্ঞরা তাজ্জব বনে যান। ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক-এর পোষা পাইথনের চিকিৎসা করতে মিন্টুবাবুর ডাক পড়ে, ভুটানেই রাজার পোষা সাপেদের চিকিৎসক হিসেবে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার প্রস্তাবও দেওয়া হয় তাঁকে। অথচ স্বদেশে যোগ্য সম্মান পাননি এই ব্যতিক্রমী মানুষটি। গোটা জীবনের স্বপ্ন ছিল ধূপগুড়িতে একটি সর্প উদ্যান ও সর্প-সংগ্রহশালা করবেন। রাজা আসে, রাজা যায়। কিন্তু মিন্টুবাবুর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

মুদ্রণশিল্পে ধূপগুড়ির মতো একটি প্রত্যন্ত এলাকায় থেকে প্রায় বিপ্লব করেছেন মলয় সরকার। তাঁর হাত ধরেই এখান থেকে প্রকাশ পেয়েছে কত অসাধারণ বইপত্র-স্মরণিকা। ডিজাইনার হিসেবে তাঁর ভাই দীপেশ সরকারের কাজও মনে রাখার মতো।

মনোজ ঘোষ, উদয় সরকার, তুষার মণ্ডল প্রমুখ চিত্রকররা দারুণ সব কাজ করে চলেছেন।

এ শহরের অন্যতম প্রিয় আয়োজন বইমেলা। ১৯৮৯ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলে শিক্ষক ও সমাজকর্মী জাতীশ্বর ভারতী-র প্রস্তাবে ও কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তের সমর্থনে অনেকের সহযোগিতায় প্রথম বইমেলা হয়েছিল। চার বছর সেখানে দারুণ সুন্দর পরিবেশে বইমেলা হয়েছিল। পরবর্তীতে তা ডাকবাংলো ও তারপরে ফুটবল মাঠে চলে আসে। মেলাকে কেন্দ্র করে চলে সাংস্কৃতিক উৎসব। তবে অতীতের আন্তরিকতা অনেকটাই হারিয়ে গেছে। সঙ্গে বইমেলার আদর্শ অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে রাজনৈতিক খবরদারি। এখন আবার বইমেলা আর গ্রন্থমেলার বিভাজনে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কিন্তু ধূপগুড়ির মানুষ চান রাজনীতিমুক্ত বইমেলা।

পড়াশোনাতে ধূপগুড়ি অনেকটা এগলেও এখনও প্রচুর খামতি। ১৯৮১ সালে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। তবু এখনও বিজ্ঞান নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে যেতে হয় বাইরের কলেজে। সদ্য পথচলা শুরু করেছে একটি মহিলা কলেজ। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর ভিড় সামলাতে এ দুটি কলেজ যথেষ্ট নয়। রয়েছে শিক্ষকের অভাব। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। একটি বেসরকারি বি এড কলেজ চালু হয়েছে।

আর স্বাস্থ্য পরিষেবায় ধূপগুড়ি দীর্ঘ তিমিরেই থেকে গেছে। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এখনও স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মর্যাদা পেল না। নেই অপারেশন থিয়েটারের সুবন্দোবস্ত। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগ একটু জটিল হলেই রোগীকে বাইরে নিয়ে ছুটতে হয়। বেহাল রাস্তায় অনেক সময়ই রোগীর প্রাণসংশয় হয়। সে অর্থে ভালো নার্সিং হোমও গড়ে ওঠেনি।

অনেক না পাওয়ার মধ্যেও ধূপগুড়ির বিজয়পতাকা ওড়ে তার কালীপুজোয়। সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে কালীপুজো নিয়ে ধূপগুড়ির বিস্তর নামযশ। বছরের পর বছর তাক লাগিয়ে চলেছে এখানকার এস টি এস ক্লাব। বিশাল বাজেটের পুজো শুধু নয়, আয়োজনের জৌলুষ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এছাড়াও শান্তি সংঘ, ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন, সুহৃদ সংঘ, এভারগ্রিন ক্লাব ইত্যাদিও সাড়া ফেলে। বৈরাতিগুড়ি সাম্প্রতিককালে ভীষণ নজর কেড়েছে থিমপুজোয়;তাদের থিমে প্রায় নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে টোটোপাড়া, নাগাল্যান্ড, বক্সা ফোর্ট ইত্যাদি। প্রায় পক্ষকাল মেলা, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদিতে মেতে থাকে ধূপগুড়ি।

ধূপগুড়ির তীব্রতর টেনশনের দিনরাত গেছে ২০০১/২০০২ নাগাদ। সন্ত্রাসের ভয়াবহতা দেখেছে এ শহর। ২০০২-এর ১৭ আগস্ট সদ্য সন্ধেয় ধূপগুড়ি সিপিএম পার্টি অফিসে জঙ্গি হানায় প্রাণ হারান জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তৎকালীন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গোপাল চাকী; সঙ্গে আরো চারজন। অনেক মানুষের চোখের সামনে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করতে করতে জঙ্গিরা শহর ছাড়ে। তার কিছুদিন আগেই ধূপগুড়ির একটি প্রাইমারি স্কুলে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন স্থানীয় সিপিএম নেতা সুভাষ সরকার। সেই রক্তের দাগ মুছে ধূপগুড়ি উঠে দাঁড়ালেও ওই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেনি এ শহর।

এই পুর শহরে ছোটদের বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা নেই। খেলার জন্য মাঠ নেই। নিকাশি ব্যবস্থা এখনও ভালো নয়। বৃষ্টি হলেই মূল শহরের রাস্তাতেই জল জমে যায়। রাস্তা দখল করে অটোস্ট্যান্ড, স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের অভাব পীড়া দেয়। ইদানীং রাস্তার পাশে ড্রেনের কাজ চলছে। তৈরি হয়েছে একটি কমিউনিটি হল। কিন্তু ঘিঞ্জি বাজারের ভেতর হওয়াতে তা অনেকটাই মার খেয়েছে। কমিউনিটি হলের দাবি যতটা ছিল, তৈরির পর সেখানে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ততটা হয় না। পুরসভার উদ্যোগে একটি ম্যারেজ হল তৈরি হলেও জায়গা নির্বাচনের ত্রুটিতে সেটি প্রায় ব্রাত্যই হয়ে পড়ে রয়েছে। আর একটা কথা, জেলা পরিষদের বাজারটিরও এখন শোচনীয় হাল। এটিরও সংস্কার জরুরি।

ডুয়ার্সের এই দরজা-শহরে পর্যটকদের থাকার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন জায়গা তৈরি করা যেতে পারে। মিন্টু চৌধুরীকে প্রকৃত গুরুত্ব দিয়ে একটি স্নেক পার্ক তৈরি করা গেলে ধূপগুড়িকে পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনা যায়। তখন ধূপগুড়ি রেলস্টেশনে নেমে পর্যটকরা ছড়িয়ে পড়তে পারেন সবুজের অন্দরে।

অমিত কুমার দে

অনুক্ত

তোকে আজ এই চিঠিটা লেখার কথা ছিল না দীপেন, এই চিঠিটা তুই পাবি, তাও নিশ্চয়ই তুই আশাই করিসনি। কিন্তু লিখছি, লিখতে হল।

আমি এখন আমার ঘরে একা। আমার ঘরে যে মহিলাটি কাজ করে, সেই শোভনাদি কিছুক্ষণ আগে কাজ শেষ করে চলে গেছে। এতক্ষণ আমি বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বসে দূরে জয়ন্তী পাহাড়ের মাথায় তাকিয়ে ছিলাম, ওখানে শ' চার-পাঁচেক উড়িয়া লেবার তাঁবুর তলায় এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। সারাদিন ওরা অমানুষিক পরিশ্রম করে পাথর ভাঙে, রাতটুকু ওদের একান্তই নিজের। কনট্রাক্টরের কোনও বাবুটাবু আসে না এই সময়টাতে। তাঁবুর ভিতরে ওরা এখন অনাবিল আনন্দের কোলাহলে মুখরিত। আমি এতক্ষণ বাইরে উদ্দেশ্যহীন ওদিকে চোখ রেখে বসেছিলাম। চারিদিকে গোলাকার ঢালু টিলার মাথায় আমার ঘরটা ছবির মতো সুন্দর, নীরব, শান্ত। আমার ঘরের আশপাশে কোনও লোকজন বা বসতি নেই। কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহর গাছে থৈ থৈ করছে আমার ঘরের চারপাশটা। রাতের অন্ধকার মুছে গেলে দিনের আলোয় মনে হয়, কোনও শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা একটা সুন্দর ছবি, আর আমি সেই ছবিতে বসে পথহারা এক পথিক।

হ্যাঁ, যে কথাটা লিখতেই এই চিঠিটা, সেটা তো আগে শুনবি! আমার ঘরের ঠিক নীচটায় বেশ চওড়া জয়ন্তী নদী। নদীর বুক চিরে ঝর্ণাধারার মতো তির তির করে জল বয়ে যাচ্ছে। সেই জলধারার একটানা কল কল ধ্বনি বহু দূরে গেলেও কানে ভেসে আসে। বেশ বোঝা যায় নদীটা জীবন্ত। দু'পাশের চওড়া নদীপথ ঝকঝকে রুপোলি বালিতে মোড়া। মাটি নেই, কাদা নেই। শুধু নদীটার পেট-বুক জুড়ে এখানে ওখানে অসংখ্য ছোটবড় টিলা, পাথরের চাঁই মাথা উঁচিয়ে আছে। চাঁদের আলো শাল-সেগুনের ফাঁকফোকর দিয়ে ফালি ফালি হয়ে এখানে ওখানে পড়েছে। চাঁদের চক্‌চকে আলো পাথরের টিলাগুলোর ওপর পড়ে যেন মনে হচ্ছে পাথরের টুকরোগুলো বরফের এক একটা চাঁই।

আমি তোকে যে নদীটার কথা বলছি, সেই জয়ন্তী নদীটা বর্ষায় ভয়ানক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে খরস্রোতা। বছর বছর ধরে তার আঘাত, আর ঘর্ষণ, আবেগ সহ্য করে করে এইসব পাথরের চাঁইগুলোর শরীরে নানান মাপের বিমূর্ত শিল্প তৈরি হয়েছে যেন। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে তৈরি হওয়া অদ্ভুত সব ভাস্কর্য।

তুই তো জানিস দীপেন, এখানে আমার কাজ বলতে কিছুই নেই। বর্ষা নামলে নদীর জল মাপা, সার্ভেয়ারের যা কাজ আর কি, আর সেটা সময়মতো ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দেওয়া। ওই বর্ষাকালেই যা একটু-আধটু কাজ, বছরের বাকি সময়টা শুয়ে-বসেই কেটে যায় আমার। আমি জয়ন্তী পাহাড় বেয়ে উঠে যাই, ডলোমাইট ভাঙা দেখি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যাই একাকী। কখনও আবার লাইম কোম্পানির ভিতরে ঢুকি। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, লম্বা চোঙা বেয়ে দলা দলা ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশ ছুঁতে। এখানটায় রোজ একটা করে সোনাঝরা রোদ্দুরে ঝলমল শীতের দুপুর

মেয়েটা আমাকে দেখে না, আমার দিকে চোখ তোলে না, ওর ঝলমলে শরীরটা নদীর চড়া ধরে নেমে যাচ্ছিল জয়ন্তীর নদীর বুকে, ঠিক যেখানটায় তির তির করে কিছুটা জল কল কল শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিল। ওর পা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছিল জয়ন্তীর নদীর স্বচ্ছ টলটলে জলরাশি। তার নীচে রূপোলি বালি। মেয়েটা জল তুলে তুলে মাথায় ঢালল। চড়ায় উঠে এসে মুক্ত উজ্জ্বল রোদে দাঁড়িয়ে গা-মাথা মুছল। চুল ঝাড়ল। তারপর তর তর করে ওপরে উঠে গিয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে এক ফালি রাস্তা ধরে চলেও গেল।

পেয়ে যাই। আমি পা পা নদীতে নেমে যাই, বালির চরায় পায়ে হেঁটে এ-মাথা ও-মাথা করি। তির তির করে বয়ে যাওয়া জলে পা ডোবাই, জল পেরিয়ে ওপাড়ে যাই, আবার চলে আসি এপাড়ে। আবার কখনও-সখনও গিয়ে বসে থাকি উঁচু পাথরের টিলার ওপর। এভাবে দিন শেষ হলে, একটু একটু করে পৃথিবীর বুক থেকে সবটুকু অলো মুছে যাওয়ার উপক্রম হলে আমি ফিরে আসি আমার ছবির মতো ঘরটায়। একাকী বোবা হয়ে বসে থাকি বাইরের বারান্দায়। এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করে চুপচাপ শব্দ তুলে কাজ শেষ করে শোভনাদি। এক সময় শোভনাদিও সামনে এসে বলে, আমি যাইগো বাবু....

আমি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিই। বাইরেটায় নিঃসীম শূন্যতা। জনমানবশূন্য গভীর রাতে কখনও কখনও বাঘের গর্জন, হাতির ডাক শোনা যায়। হাতি প্রায় প্রতিটি রাতেই জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমার ঘরের চারপাশটায় থপ থপ পা ফেলে হেঁটে যায়। আমি জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে দিব্যি এসব ব্যাপারগুলো দেখি। দীপেন, এরকম নির্বাসিত একটা জীবন আমি কোনও দিন চাইনি রে। আমি এভাবে গভীর দুঃখের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই না। হ্যাঁ, দুঃখই তো। একা একা এভাবে থাকতে হয়ে আমাকে, আর আমার নিয়ত মনে হতে থাকে, আমিই পৃথিবীর একমাত্র অভাগা, দুঃখী মানুষটা! তোদের ছেড়ে এসে আমি কীভাবে আছি, আমার রোজনামচা শোনাতে তোকে এ চিঠি লেখা নয়। তোকে এ চিঠিটা লিখতে হল শুধুমাত্র সীমার জন্য। সীমার কথায় পরে আসছি।

রোজই তো আমি নদীতে নেমে যাই, একাকী গিয়ে উঠে বসে থাকি উঁচু উঁচু টিলার ওপর। চারিদিকে তখন উঁচুনিচু ভাঙাচোরা ছোটবড় টিলার ওপর সোনালি রোদ ঝলমল করে। পাথরের নুড়িগুলো দূর থেকে রোদে মাখামাখি হয়ে ঠিক মনে হতে থাকে যেন এক-একটা সোনার চাঙড়। ক'দিন আগে, ঠিক তখন বিকেলটা, তিনটে-সাড়ে তিনটে হবে হয়তো, সেই সময়টায় একটা পনেরো-ষোলোর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের মেয়ে, নদীর ওপাড়ের শালবন থেকে নেমে এল নদীতে। ওর পরনে নোংরা কাপড়, গায়ে ব্লাউজ নেই, কাপড় জড়িয়ে আঁটোসাঁটো করে বুক আর কোমরে বাঁধা। মাথার চুল জড়ানো গামছা দিয়ে। আমি কৌতূহলবশত টিলা থেকে নেমে পা পা করে এগিয়ে দেখি, মেয়েটা জ্যান্ত, যেন ওর কালো কুচ কুচ শরীরে পাহাড়ী কাদামাটি মাখানো আছে। মেয়েটির মিষ্টি পাতলা ঠোঁট। কোনো ব্রা কিংবা ব্লাউজ না থাকায় ধুলোবালি মাখানো স্তনের আভাস ওর কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে আসছিল। আমি এগিয়ে যেতেই মেয়েটা মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দেখি কিশোরীর শরীরে জলজঙ্গলের শ্যাওলা মাখামাখি আর গোটা শরীরে আদিমকালের বনজ রহস্য। ওর সমস্ত শরীরের থেকে যেন যৌবন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সামান্য লজ্জার প্রলেপ ছিল ওর মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার অপরিসীম ভঙ্গিমায়। আমি পাথরের মূর্তি হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখি কিশোরীর দিকে।

শোন্ দীপেন, আমি যেখানটায় বসে থাকি রোজ রোজ, তার চারপাশটায় এত সৌন্দর্য, এত নীরবতা-নির্জনতা, যা নিজ চোখে না দেখলে ভাবা যায় না, আর আমি তা দেখি রোজই। কিন্তু তোকে তার সবটুকু বুঝিয়ে লিখতে পারব না। সবটুকু লিখলেও, কিছু না কিছু বাদ থেকেই যাবে। আমি যে স্বপ্নের মেয়েটির কথা বলছি, সেই মেয়েটির আকস্মিক উপস্থিতি যেন আমার চারপাশটার বর্ণনা করা যায় না এমন এক সৌন্দর্যকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছিল। আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি অগাধ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনার মধ্যে। আমি যেন বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলাম, কী করে মুখের বাইরে কথা বার করতে হয়, যেন আমি সেটাই জানি না, আমার একজোড়া ঠোঁট অসাড়।

মেয়েটা আমাকে দেখে না, আমার দিকে চোখ তোলে না, ওর ঝলমলে শরীরটা নদীর চড়া ধরে নেমে যাচ্ছিল জয়ন্তীর নদীর বুকে, ঠিক যেখানটায় তির তির করে কিছুটা জল কল কল শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিল। ওর পা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছিল জয়ন্তীর নদীর স্বচ্ছ টলটলে জলরাশি। তার নীচে রূপোলি বালি। মেয়েটা জল তুলে তুলে মাথায় ঢালল। চড়ায় উঠে এসে মুক্ত উজ্জ্বল রোদে দাঁড়িয়ে গা-মাথা মুছল। চুল ঝাড়ল। তারপর তর তর করে ওপরে উঠে গিয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে এক ফালি রাস্তা ধরে চলেও গেল। আমি ওর পিছু পিছু খানিকটা পথ এগিয়ে গেলাম। কিছু সময় পর দেখি, ও নেই। ও গাছগাছালির আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসেও আমি মেয়েটিকে ভেবেছি। রাতভর আমি ঘুমতে পারিনি। যেন ওর আয়ত চোখের মুখাবয়বটা একটা জলছবির মতো আমার চোখের ওপর টল টল করে ভাসছিল রাতভর। আমি এ যাবৎ কত মেয়ে দেখেছি তার পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি, অসংখ্য। কিন্তু আমি এই মেয়েটিকে কিংবা এরই মতো আর কোনও মেয়েকে তো এর আগে কোথাও দেখিনি। মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, ওর হাঁটার মধ্যে আমি ছন্দ দেখেছিলাম, যাকে কবিরা শিল্পটিল্পও বলে থাকে।

এভাবে একটা রাত নিঃশেষিত হয়ে গেল। সকালে উঠে টুকটাক একাজ-ওকাজের মধ্যেও দিনভর মেয়েটির কথাটাই আমার মনে হয়েছে। মেয়েটাকে দেখছি, ওর একজোড়া ভাসা ভাসা বড় চোখও দেখছি,

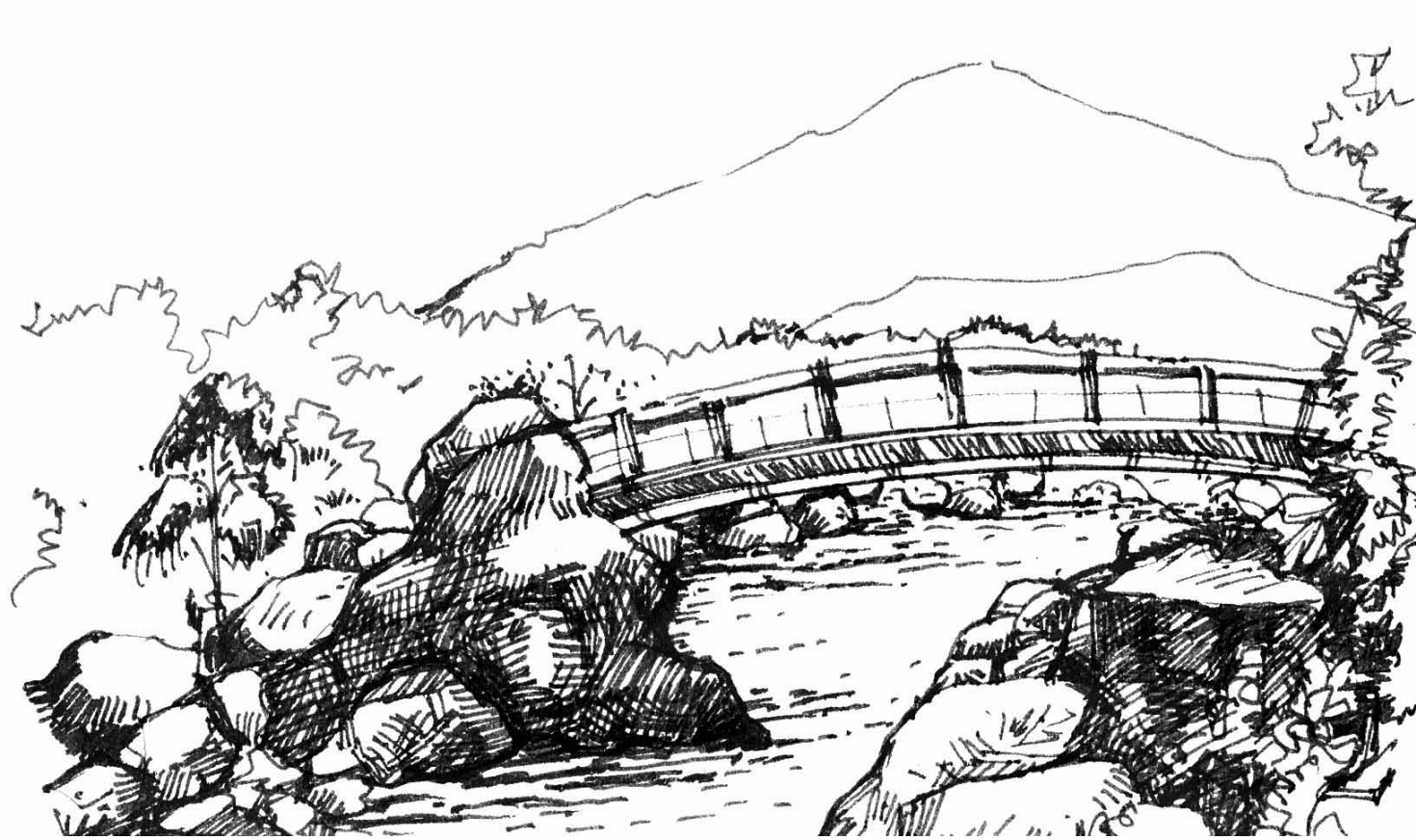

ওর কোমর অব্দি লতিয়ে-পড়া কালো কুচকুচে চুল দেখছি, ওর কালো শরীরটাও দেখছি, অর্থাৎ কিনা, কী না দেখেছি মেয়েটির! মেয়েটি সেদিন বিকেল থেকে আমায় ভাবাচ্ছিল ক্লান্তিহীন। বুনো লতা-গুল্মের মতো বেড়ে ওঠা লক্‌লকে সবুজ সতেজ একটা মেয়ে এমন কর্মহীন নির্জনতার মধ্যে আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে মনে মনে। আমি ওকে দেখব, ওকে নিয়ে ভাবব, না দৈনন্দিনকার কাজকর্ম সারব। চুপচাপ কেবলই বসে বসে মেয়েটাকে ভাবতে ভালোই লাগছিল আমার।

বেলা দুটো না বাজতেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই। জয়ন্তী নদীর রূপোলি বালি কেটে কেটে আমি ঠিক সেদিনের ঘটনাস্থলে চলে যাই। আমার ভিতরে আত্মগোপন করে থাকা আর একটা মানুষ ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাকে নিয়ে যায় ওখানে, এবং আমাকে বসিয়ে রাখে যতক্ষণ না মেয়েটি আসে। একটা নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। ওই মেয়েটিকে দেখার। তো সেদিনও মেয়েটা এল। সেদিন মেয়েটাকে অবাক চোখে আরও দেখলাম। ভিতরে ভিতরে আমার কী হচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন আমার ভিতরে কয়েক শ' ক্ষত থেকে রক্ত চোঁয়ানো শুরু হয়েছে। কখন কীভাবে আমার বুকের মধ্যে একটা তাণ্ডবলীলা, একটা ভাঙচুর শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা আমি বলতে পারব না রে দীপেন। সবাইকে সব কিছু বলা যায় না, শুধু নিজের কাছেই নিজের চোরা উপলব্ধি। এসব নিয়ে আমা র এখানকার নিঃসঙ্গ জীবনটা ছুটছিল তর তর করে, আমি একটা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছিলাম, এই মেয়েটা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনও বাধাকে আমি মানতেই পারব না, যেন যে কোনও শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তিটা রাখি আমি। আমি নিজেই তো অবাক রে দীপেন, কোথা থেকে পেলাম এত সাহস, এত শক্তি? এসব কিছুকে কী বলবি তুই, ভালোবাসা? 'ভালোবাসা' শব্দটা আমি শুনেছি ইতিপূর্বে, জীবন দিয়ে দেখিনি কখনও। ভিতরের কোন উপলব্ধি, কোন অনুভূতিকে ভালোবাসা বলা হয়, তা আমি জানি না। এই মেয়েটাকে দেখা অব্দি আমার মধ্যে মৃতপ্রায় মানুষটা অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে উঠেছিল একটু একটু করে। আমি মরে যেতে পৃথিবীতে আসিনি, চিরদিন বেঁচে থাকতেই তো আমার এখানে আসা, এমন এক কঠিন উপলব্ধির, জটিল ভাবনাচিন্তার মই বেয়ে আমি তর তর করে উঠে যাচ্ছিলাম অনেকটা দূর অব্দি।

একদিন মেয়েটা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ঘটিতে জল তুলে তুলে মাথায় ঢালছিল। আমি ওর অনেকটা কাছে দাঁড়িয়ে। আমি এরই মধ্যে বেশ সাহসী হয়ে উঠেছি। মেয়েটার জন্য আমার বুকে সহস্র সংলাপ জড়ো হয়ে আছে, শুধু বলতে পারি না কোনো কথা। আমি ওকে ডাকি আলতো করে, 'তুমারা নাম ক্যা হ্যায়, কিধার রহতা হ্যায় তুম?'

ও মুখ ফিরিয়ে দেখে, সেই মানুষটা! যে মানুষটা রোজ একজন বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চোখ দিয়ে ওকে চাটে। আমাকে দেখে ও খিল খিল করে হেসে ওঠে। আমি ওর হাসির শব্দ শুনি, ঠিক যেন ঝর্ণার জল গড়িয়ে পড়ার ঘুঙুর বাজানো মিষ্টি শব্দটাই। ও আমার কথার জবাব দেয় না। হাসল শুধু। অদ্ভুত সে হাসি। মানুষ এত সুন্দর ঘুঙুর বাজানোর মতো করেও হাসতে পারে, তা আমার জানা ছিল না দীপেন।...এভাবে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন মেয়েটা চলে যাওয়ার পর এক সাঁওতাল বৃদ্ধার সঙ্গে ওর ঘরসংসার নিয়ে কীসব কথা হল হাত নেড়ে নেড়ে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে, ওদের দুজনকে দেখছি। বৃদ্ধা জয়ন্তী চা-বাগানে পাতা তোলার কাজ করে। পরে বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ওই মেয়েটা সীমা। পাহাড়ের ওপরে দিনভর মাথায় করে ঝুড়ি ঝুড়ি ডলোমাইট টেনে নিয়ে গিয়ে লরিবোঝাই করে। দিন ফুরোলে শাল-সেগুনের জঙ্গলে তলাপাতা, ঝোপঝাড় দিয়ে বানানো ঘরে

ফিরে যায়। ঘরে ওর ছোট ছোট দুটো বোন, খোঁড়া মা। ডলোমাইটের বড়ো ঢেলা পড়ে ওর মা'র জখম ডান পা-টা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। এখন সীমার মাথায় সংসারটা।

আজ দুপুরের কথা। আমি অন্য দিনের চাইতে অনেকটা আগে চলে গেলাম ওখানে। নদীর পাড়ের শাল-সেগুনের জঙ্গলের মধ্যিখান দিয়ে যে রাস্তাটা বেয়ে সীমা রোজ নদীতে আসে স্নান করতে, কলসি ভরে জল নিতে, আমি সেই রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে, গাছের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। সীমা আসবে এ রাস্তা ধরে অন্য দিনের মতো। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি, ওপরে দুলছে লম্বা লম্বা আকাশছোঁয়া গাছের ডালপালাগুলো। ঘন পাতায় ঢাকা গাছপালার ডালপালাগুলো হালকা বাতাসে কাঁপছে। ছোটো ছোটো রঙিন পাখি এ ডাল ও ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। শান্ত স্তব্ধ চাদ্দিকটা। আমার আর সীমার জন্য অপেক্ষা করছে সবকিছু মুখ বন্ধ করে। মনে মনে আমি সবটুকু পথ এগিয়ে এসেছি এতদিনে। সীমার মধ্যে আমি অনাদি অনন্তকাল অব্দি বেঁচে থাকতে চাইলাম। জীবনে আমি বকুলফুলের গন্ধ পেতে চাইলাম সীমাকে পেয়ে।

দীপেন, তুই হয়তো ভাবছিস, এসব আমি কী করছি। একটা পাহাড়ি মেয়ে, যার এমন চেহারা, যার মধ্যে শিক্ষার আলো বলতে কিচ্ছুটি নেই, যার বংশ পরিচিতিটাও নেই, এমন একটা বাজে মেয়ের মধ্যে ডুবে মরতে চাইছি। এমন একটা ভয়ংকর বাজে সিদ্ধান্ত, ভাবাই যাই না! আমি জানি আমার এমন সব কথা শুনে তুই কী বলবি। জানি তো, তুই না বলে পারবিই না যে, আমি আত্মহননের পথেই এগচ্ছি। একটা দুর্গন্ধময় পচা ডোবাতেই আমি ডুবে মরতে চাইছি।

কিন্তু তুই সেটা বলবি কেন রে দীপেন? সীমার মধ্যে শিক্ষার আলো নেই, কিন্তু আমি? আমি তো শিক্ষিত একজন মানুষ রে। আমার মধ্যেকার শিক্ষার আলোতেই তো আমি সীমাকে খুঁজে পেয়েছি। ছায়াছন্ন টলটলে পুকুরের মতো ওই সীমা এমন এক বিশ্বাসের বৃত্তের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি বিশ্বাস করতে পারি— ও আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে চিরকাল, এটা আমার পবিত্র বিশ্বাস। আমার মধ্যেকার এই রক্তাক্ত বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে বলবি? তাছাড়া ওকে দেখা থেকে যে আমার মধ্যে একটা তাণ্ডব শুরু হয়েছে, একটা শব্দহীন তোলপাড় একটু একটু করে এতটা বড় হয়েছে, সেই ঝড়টাকে থামাই কী করে? এই ঝড় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না, ওর কাছে গেলেই মনে হয় এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার মধ্যেকার যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা, যন্ত্রণা, দুঃখ-টুঃখগুলো সব কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, জুড়িয়ে যায়।

তো কিছুটা পর দেখি সীমা আসছে। ওকে দেখেই আমি উঠে দাঁড়াই। ও কাছাকাছি হতেই পথ অবরোধের ভঙ্গিমায় ওর ঠিক সামনেটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে সটান বলি বসি, 'সীমা, তুমকো হাম পেয়া করতা হ্যায়, তুম স্বীকার হো যাও কি তুমভি মুঝে.....'

ও নির্বাক একটা কালো পাথরের মূর্তির মতো মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দু'হাতের থাবায় ওর মুখটা চেপে ধরে একজন ভিক্ষুকের মতো করে আবার বললাম, 'আমার বাত্ সচ মানো সীমা, তুম স্বীকার হো যাও!'

সীমার জবাব দিতে দেরি হচ্ছিল। আমার বুকের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে ভাঙচুর চলছে, যেন এক রাজ্যের পাগলা ঘোড়া দপ দপ শব্দ তুলে দূর থেকে আমার দিকে ছুটে আসছে। মূহূর্তের মধ্যে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে গেছি। ভিতরে ভিতরে আমি কাঁপতে শুরু করি।

ও নিমেষকাল আমার চোখে চোখ রাখল, তারপর কী বলল জানিস? বলল— ওঁঙা ওঁঙা!...

আমি বেকুবের মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে সীমার ঠোঁট নড়া দেখি। আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড় করিয়ে রেখে ও চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মাথায় ঝিম্ ঝিম্, কানে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। শরীরের যাবতীয় রক্তকণিকা কেমন অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুতগতিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। ওভাবে কতটা সময় ওখানটায় একজন ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা বলতে পারব না! ...

ঘরে ফিরে এসে এতটা সময় বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে আমি এতদিনের বেড়ে ওঠা ব্যাপারটা নিয়েই ভাবতে বসি। মাথামুণ্ডুহীন ঘটনাটা আমার মাথায় ঢুকে কেমন জট পাকিয়ে তুলছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসেও আমি কেমন জয়ন্তী পাহাড়ের ওপর দেখছিলাম— যেন সীমা ঝুড়িভর্তি ডলোমাইট নিয়ে নিয়ে লরিতে ফেলছে। ঝুড়ির ভারে ওর ঘাড় নুয়ে যাচ্ছে। ওর মুখে প্রতিবাদ নেই তবু। ওঁঙা ওঁঙা শব্দ তুলে ওর কোনও কথা তো ও কাউকে বলতে পারে না! বোঝাতে পারে না। বোঝাতে পারে না আমি ওর কাছে যেটা চেয়েছিলাম এবং আমার কথাটা শুনে ও যে ওঁঙা ওঁঙা বলে কী বলতে চেয়েছিল, আমায় কী বোঝাতে চেয়েছিল, আমি তো ওই ব্যাপারটাই বুঝে নিতে পারিনি রে দীপেন। আমি কী? একটা যা-তা মানুষ, না? এরপরও আমি ছুটে গিয়েছি কতবার, ওই ওর বলা 'ওঁঙা ওঁঙা' শব্দ দুটোর মানেটা বুঝে নিতে। কিন্তু কোথায়, আমি তো ওর বলা কথাটার মানেটাই বুঝতে পারলাম না!

তো শোভনাদি চলে যেতেই মনে হলো, ব্যাপারটা তোকে লিখি। আমার এই ঘটনাটা নিয়ে তুই কী ভাবতে পারিস, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মানসিকতা, আমার রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে কটাক্ষও করতে পারিস তুই, কিংবা এও ভাবতে পারিস, বিভোরটা নষ্ট হয়ে গেছে। জঙ্গলে থাকতে থাকতে জংলিই হয়ে গেছে। কিংবা তুই আমার আত্মহননের কথাটথা বলেও গালমন্দ করতে পারিস।

সে যাই হোক, কারও ভাবনাচিন্তার ওপর অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রতিটি মানুষের মাথায় তার নিজস্ব চিন্তাভাবনাটা এগিয়ে যায় তার আপন ইচ্ছায়, সেখানে কারও শাসন-অনুশাসন খাটে না। সীমাকে ঘিরে আমার বুকের মধ্যে যে ঘুঙুরটা বেজে উঠেছিল, তার মধ্যে আত্মহনন করার কথাটা কী করে উঠে আসে সেটাও বুঝি না।

আমি জানি না, রোজই যেমন যাই, কালও তেমনি করে আমি ওই নুড়িগুলোর ওপর গিয়ে বসব কিনা। আমার আজকের উপলব্ধিটা আমাকে ঘিরে নতুন করে আবার কোন খেলার ছক কাটে, তা আজ শেষ হয়ে কাল শুরু হলেই মাত্র বুঝতে পারবে। ওর ওই বলা কথাটার তো একটা কোনও মানে থাকতেই হবে, তাই না?

তোকে এই চিঠিটা লেখা শেষ করা থেকেই আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করে থাকব। তুই আমার অপরাধটা কোথায়, সেটা চিহ্নিত করে দিবি এ চিঠির জবাবে। আমার এই পরম বিশ্বাসটুকু আজ অব্দি কখনও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আমার সুখ বলিস, দুঃখ বলিস, শান্তি বলিস, অশান্তি বলিস, তা সবই তো একটা রক্তাক্ত বৃত্তে বন্দী হয়ে গেল রে দীপেন। তুই এটাকে কী বলবি? আমায় বলতে পারবি— সীমার বলা ওই ওঁঙা ওঁঙা শব্দ দুটোর আসল মানেটা কী?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

রংরুটের বই

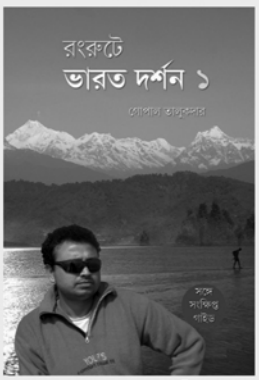

কেবল ক্যামেরায় নয়, ডায়রির পাতায় ভারত দর্শন। মূল্য **১০০ টাকা**

এবারে রয়েছে সাগর সৈকত ধরে পশ্চিমে **গুজরাত** থেকে কোঙ্কন উপকূল বরাবর **মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা** হয়ে **তামিলনাড়ু**। মূল্য **৬০ টাকা**

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল বেড়াতে যাওয়ার হালহদিশ। মূল্য **১০০ টাকা**।

হিন্দুস্থান কি দিল দেখো।
মধ্যপ্রদেশ আবিষ্কারের দীর্ঘ কাহিনী বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম। মূল্য **২০০ টাকা**।

মূল্য **১০০ টাকা**।

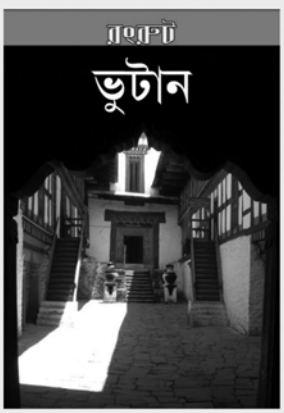

মূল্য **১০০ টাকা**।

মূল্য **১০০ টাকা**।

মূল্য **১০০ টাকা**।

সব্যসাচী চক্রবর্তীর কেনিয়া সাফারির ভিডিও এবার DVDতে

এছাড়াও **বেণুদার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে** বইটিও পাওয়া যাচ্ছে

মূল্য ৩০০ টাকা।

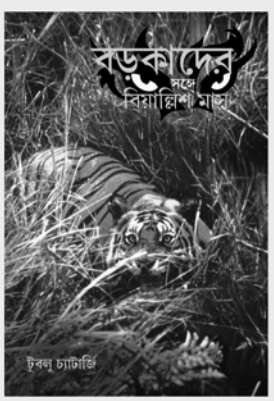

এ কোনও ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির গল্প নয়, একাহিনী অরণ্যের দিনরাত্রির। ক্যামেরা বাগিয়ে জঙ্গলে ছোটা মানুষের সংখ্যা আজ কম নয়, কিন্তু জঙ্গলে আস্তানা গেড়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটানোর অভিজ্ঞতা ক'জন শহুরে অরণ্য প্রেমীর আছে? **১২০ টাকা**।

শুভেন্দু ঘোষ। গল্প সংকলন। **ফণিমনসা**। ১২০ টাকা

দীপিকা ভট্টাচার্য। **হালফিল বর্মা মুলুকে**। ৬০ টাকা

অমিত কুমার দে। কাব্যগ্রন্থ। **ডুয়ার্সের কাব্য** । ৬০ টাকা

বাড়িতে বসে বই পেতে হলে মেল করুন
rongroute@rediffmail.com

প্রাপ্তিস্থান

এই অবকাশে ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ২৯, ফোন ৬৫৩৬০৪৬৩, ৯৮৩০৪৪০৮০৮

অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬ ফোন ০৩৩-৩২৬২৪৬৮৫

মিনি বুক স্টল ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ৯৮৩০৭ ৫৪৪৫৬

দে'জ পাবলিশিং হাউস ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ২২৪১ ২৩৩০

এখন ডুয়ার্সে যোগ দিন

'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে যে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে তাতে আমরা অভিভূত। প্রচুর অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং সেই সঙ্গে নানা প্রশ্ন আমাদের ই-মেল বক্সে এসে জমা পড়ছে রোজ। পাঠকদের কাছে আমরা যেমন কৃতজ্ঞ তেমনই তাঁদের জ্ঞাতার্থে কতগুলি তথ্য জানিয়ে রাখি।

এজেন্ট

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকাটি কলকাতা এবং শিলিগুড়ির ডিস্ট্রিবিউটার মারফত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতার ডিস্ট্রিবিউটারের ফোন নম্বর ৯৯০৩০১৩৬১৬ এবং শিলিগুড়ির ডিস্ট্রিবিউটারের ফোন নম্বর ০৩৫৩ ২৫৩১০১৭। ইচ্ছুক এজেন্টরা এঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

গ্রাহক

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার গ্রাহক নেওয়ার ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। তবে আগামী বইমেলার সময় থেকে নতুন বছরের গ্রাহক নেওয়া শুরু হবে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে বসেই নিয়মিত পত্রিকাটি পাওয়া যেতে পারে।

ছবি ও লেখা

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় যে কেউ ছবি ও লেখা পাঠাতে পারেন, বিষয়বস্তু অবশ্যই হতে হবে ডুয়ার্স। লেখা বা ছবি সাধারণ ডাকে বা ই-মেল মারফত পাঠানো যায়।

বিজ্ঞাপন

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৯৮২২৯০।

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

তোমার জাদুতে আজ উঠল মেতে এই জীবনের ছন্দ

এলিট মানে ভালো জুতো ব্যস

Elite®

FOOTWEAR

পায়ে পায়ে আনন্দ

VISTAAR

Show Room : Lindsay Street, Hatibagan, Behala, Serampore (Hoogly), Chinsura (Hoogly), Bardhaman (2 B.C. Road, Near Karjon Gate), Durgapur (Benachiti, Kizer More), Barakar (Dishergarh Road), Coochbehar, Alipurduar, Bansdroni, Kudghat, Garia, Budge Budge, Ghatakpukur, Thakurnagar (24 Pgs N.), Saharar Hat Falta, Kakdwip, Canning, Haldia (Manjushree), Jhargram, Andul (Howrah), Bali-Badamtala (Howrah), Konnagar, Rishra, Kamarkundu, Arambag, Nagerbazar, Sodepur, Madhyamgram, Basirhat (Astana Road), Krishnanagar, Aurangabad, Baharampur (Khagra), Raghunathganj, Malda (Rabindra Avenue), Kaliachak (Malda), Buniadpur (South Dinajpur), Gangarampur, Balurghat, Raiganj, Islampur, Siliguri (Bidhan Market), Dhupguri, Falakata, Maynaguri, Dinhata, Mathabhanga, Haldibari, Dhubri **and in other states.** **Contact for New Show Room : 98314 51316 / 98313 34567**

Available in other Company approved Towns : North 24 Pgs. - Janata Shoe (Baduria), Raja Padukalaya (Shyamnagar), Minati Shoe (Bangaon), **South 24 Pgs.** - Calcutta Shoe House (Gosaba), Pather Sathi (Siddeshwar), Laltu Shoe (Kulgachhia), **East Midnapur** - Maity Shoe (Mathchandipur), **West Midnapur** - Kaushik Traders (Ghatal), Fashion Shoe (Gorbeta), **Murshidabad** - Riju Shoe (Domkal), **Durgapur** Bidhannagar - New Nibedita Shoe Stores, **Bankura** - Padukalaya, Jyotsnalok (Bishnupur), **Purulia** - Rajesh Shoe.

Contact for Dealership : 033-2215 6356 (11 A.M. to 6 P.M.)

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.